MANAB SAMAJ BIBARTAN 'O' UNNAYANER DHARA

by :

Sukumar Singh

মানব সমাজ বিবর্তন
ও
উন্নয়নের ধারা

সুকুমার সিং

প্রকাশক ঃ

মাল্‌টি বুক এজেন্সী

মহামায়াতলা গড়িয়া, কলিকাতা-৮৪

অগণিত সমাজ উন্নয়নকামী
কর্মীদের উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র ঃ

মুখবন্ধ

আমাদের সমাজে সাধারণত যারা শিক্ষা কর্মী, উন্নয়ন কর্মী কিংবা সমাজ পরিবর্তনের কাজে সরাসরি সম্পর্ক রাখেন তাদের অধিকাংশই নিষ্ঠাবান ও উদ্যোমী কিন্তু জ্ঞানের বিস্তারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে গবেষণা কিংবা অধ্যায়ণ খুব বেশি করেন না। কিংবা করতে চাইলেও সে ধরণীয় বিশেষ পুস্তক, গবেষণা দলিল ইত্যাদির প্রচুর অভাব রয়ে গেছে। আর যেগুলি রয়েছে সেগুলি এতই দুর্বদ্ধ এবং বিদেশী ভাষায় মুদ্রিত যা সাধারণ কর্মীদের পক্ষে পাঠযোগ্য নয়। ফলে বহু কর্মীরা সমাজ কাঠামোর বিশ্লেষণ, সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতি এবং উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

আমার বর্তমান গ্রন্থে যে সকল নিবন্ধগুলি একত্রে প্রকাশিত হল তা মূলত আমার গবেষণা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সংকলন মাত্র। এই নিবন্ধগুলি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর পাঠশালা' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে' তথাপি এটি একটি পুস্তক আকারে প্রকাশের জন্য আগ্রহী হয়েছি বহু কর্মীবন্ধুর অনুরোধে।

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণের জন্য কিংবা নতুন পরিকল্পনা রচনার জন্য এই পুস্তকটি যথেষ্ট নয়। তবুও সাধারণ ধারণা সৃষ্টির জন্য একজন সমাজকর্মীর কাছে এটি একটি মূল্যবান সহায়ক হতে পারে। বিশেষ করে যে সকল কর্মীগণ সেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে দারিদ্রতার বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে এবং সর্বপরি উৎপীড়ন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের সচেতন ও সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন তারা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন মানুষের কল্যাণ কেবলমাত্র বদান্যতা বা দানশীলতার মাধ্যমেই সম্ভবপর নয়, চাই এক সঠিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া।

ভারতবর্ষে দিন দিন গরীবের সংখ্যা বাড়ছে। শোষণের সকল রকম প্রক্রিয়া নতুন নতুন ভাবে সু-সজ্জিত হচ্ছে। সরকারের পরিকল্পনা-গুলি সাধারণ মানুষের বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। বাজার দর দ্রুত বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক ঋণ. সামাজিক চাহিদাগুলি পূরণে বিভ্রান্তিকর নীতি, জাত-পাত ও ধর্মকে কেন্দ্র করে বিভেদনীতি ইত্যাদি মানুষকে তার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলছে। মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর চলছে কষাঘাত। সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা ঠিক এমনই সময় আশু প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ গরীব কৃষক-শ্রমিকদের মুক্তির সন্ধান। শাসক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত সচেতন লড়াই। এ কাজ সমাধা করা খুব সহজ কাজ নয়। এর জন্য চাই প্রত্যেক সমাজকর্মীর গভীর অধ্যায়ণ ও অনুশীলন। ভাবনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই চাই রাজনৈতিক চেতনা যা ছাড়া উন্নয়ন আনয়ন প্রকৃত পক্ষে সম্ভব নয়।

সমাজ পরিবর্তনের কাজে যদি আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস বাস্তবায়িত হয় তাহলেই এই পুস্তকের স্বার্থকতা।

এই পুস্তক রচনাকালে যে সকল বন্ধু, দরদী ও সহকর্মী সাহায্য করেছেন তাদের সকলকে আমার অভিনন্দন। বিশেষ করে মালটি প্রিন্টের সকল কর্মী বন্ধু যাদের সাহায্য ছাড়া এই পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হত না। এছাড়াও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা মাস এডুকেশন সংস্থার প্রত্যেক কর্মী বন্ধুদের যারা সময় সময় আমাকে তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এবং পাণ্ডুলিপি টাইপ করে সাহায্য করেছেন। সেই সাথে আমার বিশেষ উষ্ণতা প্রকাশ করছি এক বিশেষ সাথীকে যার উদ্দীপনা ও প্রেরণা ছাড়া এই পুস্তক রচনা সম্ভবপর হত না।

এই পুস্তকের মূল্য ধার্য করা হয়েছে তিরিশ টাকা মাত্র কিন্তু যারা সমাজ উন্নয়ন সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তাদের মাত্র কুড়ি টাকা মূল্যে এই পুস্তক সরবরাহ করা হবে।

পুস্তকের সর্বপরি ব্যবহারের আশা করছি।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা উপলক্ষে।

সুকুমার সিং

সমাজ গঠনে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র চিন্তা।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সমাজ ও গোষ্ঠীতে বসবাস করছে। এই সুদীর্ঘকাল ধরেই মানুষ তার সমাজ গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তা নিয়ে ভাবনা চিন্তাও করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক ও রাষ্ট্র চিন্তাবীদ তাদের সময়কার সমাজকে মূল্যায়ন করেছেন এবং সমাজে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা এবং কি ধরণের গঠনতন্ত্র হওয়া উচিত ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমগ্র মানব সমাজে এক একজন এক এক ভাবে তার সুচিন্তিত মতামত রেখে সমাজকে একটা বিশেষ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছেন। এবং সমগ্র চিন্তা ভাবনাকে সমাজ বিজ্ঞানে পরিণত করার চেষ্টাও করেছেন। যা আজও মানুষের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করে। সমাজ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা বোধ সৃষ্টির জন্য যে সমাজ বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে তা খুবই নবীন এবং আজও সেই বিজ্ঞান শৈশবের শুরুতেই রয়ে গেছে। কারণ একমাত্র সমাজ বিজ্ঞানই যা এখনও জটিল হয়ে রয়েছে। একথা ঠিক যে, সব সভ্যতায় এবং সব যুগে দার্শনিক, ধর্মগুরু আর আইন প্রণেতাদের লেখায় এমন সব সুচিন্তিত মন্তব্য ও চিন্তা ভাবনার উদাহরণ আছে যা আধুনিক সমাজ বিশ্লেষণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোন সমাজকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজ ইতিহাস জানা একান্তই প্রয়োজন। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় চিন্তা নায়কদের কথা উল্লেখযোগ্য।

আমার এই পরিচ্ছেদে পাশ্চাত্তের রাষ্ট্র চিন্তা ধারায় প্লেটো থেকে মার্কস পর্যন্ত রাষ্ট্র সম্পর্কে মতামতগুলি তুলে ধরা হল।

প্লেটো : রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিংবা রাষ্ট্র সম্পর্কে প্লেটোর চিন্তার বিশেষ কোন সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন, নৈতিক জিজ্ঞাসা ও দার্শনিক উপলব্ধি দিয়েই কোন বিষয়কে জানতে হবে। সুতরাং রাষ্ট্র ধারণাটিকেও নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখেছেন তিনি। প্লেটোর কাছে রাষ্ট্র হল সেই আদর্শ, যার মধ্যে মানুষের সহজাত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও গুণাবলী প্রতিফলিত হয়। প্লেটো ব্যক্তি জীবনের

সঙ্গে রাষ্ট্র জীবনের গভীর মিল খুঁজে পেয়েছেন। ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, যা পার্থক্য আছে সেটা আকার বা আয়তনের। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে শ্রেণী সমন্বয়ের ধারণার বিকাশ ঘটিয়ে ঐক্য ও সংহতিকে রূপ দেয়। প্লেটো কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে আদর্শ মান হিসেবে উপস্থিত করেননি। তাঁর রিপাবলিক-এ তিনি যে রাষ্ট্র শাসনের ধারাকে উপস্থিত করেছেন তা হল শ্রেষ্ঠতমের শাসন। প্লেটো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, সকলের মধ্যে রাষ্ট্র শাসনের গুণাবলী থাকে না বা থাকা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র শাসন এক বিশেষ কলা। যোগ্যতম এবং মহৎ ব্যক্তিরাই রাষ্ট্র শাসনের উপযুক্ত। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিই হবেন রাষ্ট্রের শাসক। প্রতিটি মানুষ তার আপন আপন কর্মে নিযুক্ত থেকে রাষ্ট্রের বিপুল কর্মকাণ্ডে সামিল হবে। মানুষ বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত থাকলেও প্রত্যেকেই অপরের কর্মের ফল ভোগ করবে, এটাই ছিল প্লেটোর উপলব্ধি। প্লেটো উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মানুষকেই একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা তিনি রাষ্ট্রের হাতেই অর্পণ করেছেন। কৃষক, মজুর, ব্যবসায়ী সকলেই রাষ্ট্রের সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে এবং এই সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকবে না। প্রয়োজন ও ভোগের ক্ষেত্রে উৎপাদন-সামগ্রীকে সকলেই সমানভাবে ব্যবহার করতে পারবে এই কল্পনা প্লেটোর মাথায় ছিল। প্লেটো মনে করতেন শাসকশ্রেণী জীবন ধারণের জন্য কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা পালন করবেন। এক সঙ্গে থাকা, সাধারণ ভোজনালয়ে আহার গ্রহণ করা, স্ত্রী ও সন্তানসঙ্গ বর্জন করা, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির মোহ ত্যাগ করা ইত্যাদি কঠোর নিয়মের কথা বলেছেন।

অ্যারিস্টটল : অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র ধারণা তাঁর সমকালীন গ্রীক সমাজ ও কৃষ্টির আলোকেই বিচার্য। গ্রীক সমাজ ও কৃষ্টির ভাঙ্গনে হতাশ হয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। সমকালীন নগর রাষ্ট্রকেই অ্যারিস্টটল রাষ্ট্র বুঝেছিলেন। তাঁর মতে রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক সংগঠন এবং মানব প্রকৃতিতেই এই সংগঠনের অস্তিত্ব। রাষ্ট্র হল সেই সংগঠন যা মানুষের চরম প্রাপ্তিকে সম্ভব করে। পরিবার ও গ্রামের মধ্যে মানুষ তার

দৈনন্দিন জীবনের যে সব চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করে, রাষ্ট্র তার তুলনায় আরও অধিক ও পূর্ণতর চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করে। মানুষ সুন্দর ও মহৎ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যেই সে প্রথমে গড়ে তোলে পরিবার এবং তারপর গ্রাম। এবং ক্রমশঃ সে গড়ে তোলে রাষ্ট্র। মহৎ জীবন যাপনের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি রাষ্ট্রে বসবাসের মধ্যে দিয়েই অর্জন করা সম্ভব। রাষ্ট্র মানুষের কাছে কাম্য, কারণ কাম্য বস্তু আহরণেই রাষ্ট্রের আগ্রহ। মানুষের সুখ-সুবিধা, আশা-আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিশীল বলেই তাঁর কাছে রাষ্ট্র নামে সংগঠনটির আবেদন বা মূল্য আছে। দেহ ছাড়া যেমন হাত বা শরীরের অন্যান্য অংশের কল্পনা করা যায় না. রাষ্ট্র ছাড়া তেমনি পরিবার বা মানুষের কল্পনা করা সম্ভব নয়। অ্যারিস্টটল এই ভাবেই রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, পরিবার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান, যার মধ্য দিযে ভাব প্রথম আত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয় বা যাত্রা শুরু করে। এই পরিবার মানুষের ইন্দ্রিয়জ অভাব বা প্রয়োজন মেটায়। রাষ্ট্র বিকাশের এই পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে, পরিবার, যার মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ পারস্পরিক প্রীতি বা ভালোবাসামূর্ত হয়, সেই পরিবার হচ্ছে প্রথম পর্যায়—'থিসিস' বা 'বাদ' এর সূচক। যখন দেখা গেল যে, বহু বিচিত্র মানবিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে পরিবার খুবই ক্ষুদ্র, তখন সিভিল সোসাইটি বা পুর সমাজের উদয় হল, এই পুরসমাজ অ্যান্টিথিসিস। প্রতিবাদ পর্যায়ের। এখানে অর্থাৎ পুরসমাজে ব্যক্তি মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন অধিকার সুষ্ঠভাবে মিটল ঠিকই কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পুরসমাজ বিচ্ছিন্ন হল এবং সেই জন্য 'ভাব' এর যে ঐক্যমুখীন গতি তাও ব্যাহত হল। অন্তিম সিনথিসিস 'সম্বাদ' এর আবির্ভাব হল রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রের মধ্যে পরিবার ও পুরসমাজ উভয়ের সুবিধাই মিলিত হল এবং মিলিত হয়েও রাষ্ট্র এদের উভয়ের চেয়ে উচ্চতর ও পূর্ণতর কিছুর প্রতিনিধি, কেননা এখানে এমন একটি ঐক্য এবং সমগ্রতা সাধিত হল, যার মধ্যেই একমাত্র ভাব তার চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।

অ্যাডাম স্মিথ : দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তির আত্মস্বার্থ এবং সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ এতদুভয়ের মধ্যে নিখুঁত বা পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন সম্ভব। কিন্তু এই বক্তব্য প্রমাণের জন্য অবশ্য তাঁকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে কিছুটা অস্পষ্ট অধিবিদ্যার ছত্র-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তিনি এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন যে, মানবিক জগৎ-এর মঙ্গলময় বিধাতা দ্বারা শাসিত—এই মঙ্গলময় বিধাতার অদৃশ্য হস্ত মানবমণ্ডলীকে সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনায় পরিচালিত করে। ভাষান্তরে, মানুষ যদিও শুধুমাত্র তাঁর আত্মস্বার্থের প্রেরণায় কর্মে প্রবৃদ্ধ হয় এবং আত্মস্বার্থ ব্যতীত অন্য কিছু কামনা নাও করে, তথাপি যেভাবেই হোক না কেন, তার ফলে সাধারনভাবে, সমাজের উন্নতিই হয়।

জেরমি বেন্থাম : জেরমি বেন্থামও অবশ্যই অ্যাডাম স্মিথ এর পথই অনুসরণ করেছিলেন। তিনি অবশ্যই রাষ্ট্রকে মূলতঃ একটি শাস্তি প্রদানকারী শক্তি হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। সরকার, তাঁর দৃষ্টিতে স্বভাবগত ভাবেই একটি অশুভ শক্তি। তবুও তিনি সরকারকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। কারণ মানুষ এতখানি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নয় যে, আপনা থেকেই সমগ্র মানুষের সর্বোচ্চ সুখকামনা করবে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র এমন এক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যার উপযোগিতা আছে, এবং সেই কারণে নিজ স্বার্থেই সে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মান্য করে। উচ্চতর কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কারণ নয়, দৃষ্টি গ্রাহ্য সুবিধার বিচক্ষণ বিবেচনাই রাষ্ট্রনীতিক আনুগত্যের ভিত্তি।

জে এস মিল বিশ্বাস করেন যে, কোনো রাষ্ট্রের মূল্য নির্ভর করে, যে ব্যক্তির সমবায়ে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, সেই সমস্ত ব্যক্তির যোগ্যতা বা মূল্যের উপর। সুতরাং সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যক্তিকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করা, যাতে তার পক্ষে সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন সম্ভব হয়।

টি এইচ গ্রীন : টি. এইচ. গ্রীনের মতে বল প্রয়োগ বা শক্তি প্রয়োগের নিরিখে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যৌক্তিকতা নির্ণয় করলে চলবে না. যদিও এটা সত্য যে রাষ্ট্র প্রায়শঃ বল প্রয়োগ করে। গ্রীনের বক্তব্য এই যে, রাষ্ট্র এই সমস্ত বাহ্যিক শর্তাবলী সরবরাহ করে। কার্যতঃ মানুষের

অধিকারসমূহই তার নৈতিক শক্তি বিকাশের পক্ষে উপযোগী। বাহ্যিক শর্ত এবং রাষ্ট্র এই অধিকার সমূহের জামিনদার বা প্রতিভূ হিসাবে এই সমস্ত শর্তাবলী আয়ত্তে আনে ও সংরক্ষিত করে। রাষ্ট্র অবশ্য এই অধিকার সমূহের স্রষ্টা নয়। কারণ অধিকারের প্রকৃত উৎস মানুষের নৈতিক প্রকৃতির মধ্যে নিহিত; রাষ্ট্র শুধুমাত্র এই সমস্ত অধিকার স্বীকার করার মাধ্যমে ব্যক্তির নৈতিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। সুতরাং রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতা পরিপোষণের উপযোগী শর্তাবলী সংরক্ষণ করে; এবং এই স্বাধীনতা হচ্ছে মূলতঃ নৈতিক স্বাধীনতা। অর্থাৎ ইচ্ছা বা খুশীমত বা কিছু করবার স্বাধীনতা নয়, কোনো নৈতিক সত্তা (বা জীব) তার নৈতিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সব বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়. তাই-ই স্বাধীনতা। কিন্তু এই নৈতিক লক্ষ্য যেহেতু মূলগতভাবে, সাধারণের কল্যাণ বা মঙ্গল এবং সেই হেতু এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সর্বসাধারণ, সাধারণ সংক্রান্ত, সেজন্য রাষ্ট্রকে এ-বিষয়ে সর্তক হতে হবে যে, ব্যক্তি যেন সর্বসাধারণের কল্যাণের কথা মনে রেখেই এই নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। অর্থাৎ রাষ্ট্র এ-বিষয়ে সর্তক থাকবে যে, কোন একজন ব্যক্তি যেন এমন কিছু না করে যাতে নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য সমস্ত ব্যক্তির প্রয়াস ব্যর্থ না হয়।

কাল মার্কস: রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস বলেন, উৎপাদন পদ্ধতি ছিল যতদিন আদিম, যেখানে শ্রমবিভাগ ছিল না, সম্পত্তি—সংক্রান্ত সম্পর্কও ছিল না, এবং সে কারণে শ্রেণীও ছিল না, রাষ্ট্রও তাই আবির্ভূত হয়নি; সমাজ বিকাশের ঐ পর্যায়ে বস্তুতঃ রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে যাবার পর যখনই শ্রমবিভাগ, সম্পত্তি সম্পর্ক এবং তার ফলশ্রুতিতে আবির্ভাব হলো বিভিন্ন শ্রেণীর, তখনই শ্রেণী উৎপীড়নের সহায়ক যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের উদয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা হচ্ছে এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর শোষণের সহায়তা করা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা। মার্কস-এর মতে, তাই, রাষ্ট্রকে বাইরে থেকে সমাজের উপর আরোপিত শক্তি নয়; আসলে রাষ্ট্র সমাজ বিকাশের বিশেষ একটি পর্যায়ের ফল। অর্থাৎ রাষ্ট্র হল শ্রেণী আধিপত্যের সংস্থা, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণী পীড়নের সংস্থা, রাষ্ট্র হল এমন

শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠান, যাতে শ্রেণী সংঘাত নরম করে এই পীড়নের বিধিবদ্ধ ও কায়েম করে।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের রচনা 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' পুস্তকে বলেছেন, রাষ্ট্র মোটেই বাইরে থেকে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি শক্তি নয়, সেই সঙ্গে হেগেল যা বলতেন, 'নৈতিক ভাবের বাস্তবতা' প্রজ্ঞার প্রতিমা ও বাস্তবতা ও নয়। রাষ্ট্র হল সমাজের একটা নির্দিষ্ট পর্বে বিকাশের ফল, রাষ্ট্র হল এই স্বীকৃতি যে সমাজটা অমীমাংসেয় স্ববিরোধে জড়িয়ে পড়েছে, এমন আপসহীন বৈপরীত্যগুলি বিরোধী অর্থ-নৈতিক স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলি যাতে নিস্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও সমাজকে গ্রাস করে না বসে, তার জন্য দরকার পড়েছিল এমন একটি শক্তির যা দৃশ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান, যা সংঘর্ষকে নরম করে আনবে, তাকে শৃঙ্খলার সীমানার মধ্যে ধরে রাখবে। সমাজ থেকে উদ্ভূত কিন্তু সমাজের ঊর্ধ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, ক্রমেই বেশি করে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা এই শক্তিই হল রাষ্ট্র।

এঙ্গেলস আরো পরিস্কারভাবে বলেছেন, রাষ্ট্র রয়েছে চিরকাল থেকে নয়। এমন সমাজ ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলেছে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ক্ষমতার ধারণাও তাদের ছিল না। অর্থ-নৈতিক বিকাশের যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের ভাঙ্গনের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িত, সেই মাত্রায় এই ভাঙ্গনের ফলে রাষ্ট্র আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এমন দ্রুত পদে উৎপাদন বিকাশের এমন একটা পর্যায়ের কাছে যাচ্ছি, যখন এই সব শ্রেণীর অস্তিত্ব আর আবশ্যক থাকছে না। শুধু তাই নয়—উৎপাদনের সোজাসুজি বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। অতীতে শ্রেণীর উদয় যেমন ছিল অনিবার্য, তেমনি অনিবার্যই হবে তাদের লুপ্তি। শ্রেণী লোপের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবেই লোপ পাবে রাষ্ট্র। উৎপাদকের মুক্ত ও সমানাধিকারী সমিতির ভিত্তিতে নতুনভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠাবে সেইখানে যেটা হবে তখন তার যোগ্য স্থান : চরকা ও ব্রোঞ্জ কুঠারের পাশে পুরাবস্তুর যাদুঘরে।

সমাজ ও সমাজ কাঠামো

সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে বোঝায় বিভিন্ন সম্পর্ক সূত্রে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক সূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি। প্রাচীন যুগে গ্রীক দর্শনে প্রথম সমাজ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া যায়। সম্প্রদায় জীবনে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ও জীবন ধারার নিয়মনীতি নিয়েই প্রধানত এই আলোচনা।[১]

Maclver & Page-এর মতে, Social beings, men, express their nature by creating and recreating organisation which guides and controls their behaviour in myriads ways. This organisation, society, liberates and limits the activities of men, sets up standards for them to follow and maintain... Society is a system of usages Procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and liberties…It is the web of Social Relationships" (Society).

বৌদ্ধেরা সমাজকে বলিয়াছেন 'সঙ্ঘ', কোমটিস্টরা বলেন, হিউম্যানিটি। ভূদেবের মতে, সমাজ শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র।[২] হেগেলের মতে 'সিভিল সোসাইটি' হল 'পরিবার ও রাষ্ট্রের' মধ্যবর্তী এক স্তর। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'সমাজ' এর অর্থ হল সমাজ আর কেবলমাত্র জনসমষ্টি নয়। বরং সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যম, সামগ্রিকভাবে সামাজিক ব্যবস্থা নয়, মানুষের কর্মক্ষেত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা পরিবেশেব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য।[৩]

সমাজ সম্পর্কে মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী মানুষ সর্বাপেক্ষা সামাজিক জীব, এবং জীবন-ধারণের তাগিদে, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের

সন্ধানে তার সামাজিক সত্তার বিকাশ হয় এবং প্রথমদিকে সে সমষ্টিগতভাবে খাদ্য আহরন, শিকার করতে শেখে ও পরে শ্রম বিভাজনে অংশ গ্রহণ করে এইভাবে বাস্তবভিত্তিই তার বুদ্ধিগত, রাজনৈতিক সামাজিক ও আইনগত উপরিতল নির্ধারন করে। মার্কসীয় মতে সমাজ মানুষের প্রকৃতির ফলশ্রুতি (যেমন—সাধারণতঃ মানববাদীরা বলে থাকেন) নয়, কিন্তু ব্যক্তি সমাজেরই সৃষ্টি এবং সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল, মানুষের প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল। সমাজব্যবস্থা যে ধরনেরই হোক না কেন, দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধের মধ্যে দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন করা সম্ভব।[৪] মানব সমাজ পরিবর্তনশীল. পরিবর্তন তার নিয়ম। একশ, এক হাজার বা লক্ষ বছর পূর্বে পৃথিবীর মানুষের সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি ও চিন্তাধারা যেমন ছিল আজ তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, মানব-সমাজ কতগুলি পরিবর্তনের স্তর বা ধাপের মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। প্রথম অবস্থায় মানুষ গাছের ফল-মূল, পাতা ও পোকামাকড় সংগ্রহ করে জীবন ধারন করত এবং গাছের গুঁড়ির ফাটলে বা পাহাড়ের গুহায় বাস করত। পরের ধাপে মাছ, পশুপাখি শিকার করত। বলা বাহুল্য, মানুষের শিকারের অস্ত্র ছিল গাছের শুকনা ভাঙ্গা ডালপালা ও পাথর। পরিবর্তনের তৃতীয় ধাপে মানুষ পশুপালন ও চারন করতে শিখল। চতুর্থ ধাপে কৃষিকার্য আবিষ্কার হল। চাষের জন্য গরু-ঘোড়ার বা কলের কোন লাঙ্গলই ছিল না; মানুষ লাঠি দিয়ে মাটিতে গর্ত করে বীজ বা চারা গাছ বুনত। নৃবিজ্ঞানীদের মতে মেয়েরা চাষের আবিষ্কার করেছে; পুরুষেরা যখন শিকার করতে বেরিয়ে যেত, মেয়েরা তখন খাদ্য সংগ্রহ করত এবং অবসর মত মাটিতে বীজ ও চারাগাছ লাগিয়ে কৃষিকার্যের আবিস্কার করেছিল। প্রথম থেকে তৃতীয় ধারা পর্যন্ত মানুষকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হত খাদ্যের অন্বেষণে, কারণ এক স্থানে বেশিদিন থাকলে সেখানে খাদ্য শেষ হয়ে যেত। সবশেষে এল কল কারখানা ও যন্ত্রের যুগ। এ যুগেই আমরা আজ বাস করছি। মর্গান

দীর্ঘদিনের গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, মানুষের বিভিন্ন স্তরের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে তাদের সামাজিক রীতিনীতি আচার-বিধি এবং চিন্তাধারাও বিভিন্ন প্রকার ছিল, অধিকন্তু মানুষ যখন এক প্রকার অর্থনৈতিক জীবন ধারণ থেকে পরবর্তী অর্থনৈতিক জীবনধারণের স্তরে এসেছে, তখন তার সামাজিক আচার বিধি, রীতিনীতি, চিন্তাধারারও পরিবর্তন হয়েছে। এঙ্গেলসের মতে, "শ্রমই হল সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি এবং এই শ্রম এক অর্থনৈতিক উপাদান। প্রাণীরা শুধু বহিঃপ্রকৃতিকে ব্যবহার করে এবং কেবল মাত্র নিজের উপস্থিতির দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনে; মানুষ কিন্তু তার পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃতিকে তার উদ্দেশ্য সাধনে লাগায়, প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করে। এটাই হল মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর চূড়ান্ত ও মূলগত পার্থক্য। আর পুনরপি শ্রমই ঘটিয়েছে এই পার্থক্য"। পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে আধুনিক যুগের যে সামাজিক উত্তরণ লক্ষ্য করা যায় তাও এই শ্রমের ফসল। এই শ্রম যখন উৎপাদনে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগতে শুরু হল এবং মানুষ অধিক উৎপাদনের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল পরিবারবর্গের অন্যান্য সদস্যের জন্য এবং বন্যজন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য উদ্‌বৃত্ত শ্রম দিতে লাগল তখন থেকেই শুরু হল সমাজ পরিবর্তনের পালা। সমাজের যৌথ শ্রম প্রথা থেকে শুরু হল আদিম পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। পুরুষ মানুষেরই শ্রম অধিকভাবে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হল। সৃষ্টি হল বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং পরিবার ভিত্তিক উৎপাদন, ফলে ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হল এবং পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে শুরু শাসন আর শোষণের রাজত্ব যার ফলস্বরূপ দাস সমাজের সূচনা। ব্যক্তিগত মালিকানা বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের উপর ঝোঁক এবং পুঁজির সঞ্চার মানুষকে বাধ্য করল শ্রেণীতে পরিণত করতে। সম্পদের মালিকানা বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন ও উৎপাদন সামগ্রীরও মালিকানা ধীরে ধীরে কুক্ষিগত হল কিছু সংখ্যক মানুষের উপর। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই আরও শ্রমশক্তি। কেনা হল শ্রমশক্তি সমাজের বিরাট অংশের মানুষের। যাদেরই দাস শ্রমিক বলে পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সাথে শুরু হয় দুই ধরণের সামাজিক শ্রেণী: ক্রীতদাস শ্রেণী ও মালিক

শ্রেণী। এঙ্গেলসের মতে "এখন স্বাধীন নাগরিক ও দাসের তারতম্যে ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য যুক্ত হল। নতুন শ্রম বিভাগের সঙ্গে দেখা দিল বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের নতুন বিভাগ। তখনও যে পুরানো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালী গোষ্ঠীগুলি টিঁকে ছিল, বিভিন্ন পরিবার প্রধানদের ধন-সম্পদে অসাম্যের ফলে সেগুলিও চৌচির হয়ে গেল; এবং সেই সঙ্গে গোষ্ঠীভিত্তিক জমির যৌথ চাষবাসও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কর্ষিত জমি বিভিন্ন পরিবারের ব্যবহারের জন্যে প্রথমে সাময়িকভাবে এবং পরে চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হল; জমির পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণ ক্রমে ক্রমে এবং জোড় বাঁধা পরিবার থেকে একগামিতায় উত্তরণের সমান্তরালে ঘটেছিল। এক একটি পরিবারই সমাজের অর্থনৈতিক একক হয়ে উঠতে লাগল। বাণিজ্যের প্রসার, অর্থ, তেজারতি, ভূসম্পত্তি এবং বন্ধকী প্রথার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে চলল মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণীর হাতে ধন-সম্পত্তির দ্রুত সঞ্চয় ও কেন্দ্রীভবন অপরদিকে আসল জনগণের ক্রমবর্ধমান নিঃস্বতা ও দরিদ্রের সংখ্যাবৃদ্ধি।......সভ্যযুগে সর্বাধিক বিকাশ প্রাপ্ত দাস প্রথার প্রথম উন্মেষ থেকেই শোষক ও শোষিত সমাজের শ্রেণীভেদ ঘটে। এই বিভেদ পুরো সভ্যযুগ জুড়েই অব্যাহত রয়েছে। শোষণের প্রথম রূপ দাসপ্রথা প্রাচীন জগতের বৈশিষ্ট্য; এর পরবর্তী মধ্যযুগে ভূমিদাস প্রথা এবং আধুনিক যুগের মজুরী-শ্রম। এগুলিই সভ্যতার তিনটি মহৎ যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক পরাধীনতার তিনটি মহৎ রূপ; সম্প্রতিকালে ছদ্মবেশী হলেও অনাবৃত দাসত্বই এর নিত্যসঙ্গী।" সমাজের মধ্যে উৎপাদন ও উৎপাদন সামগ্রীর মালিকানা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই সৃষ্টি হয় শ্রেণী দ্বন্দ্ব, মার্কসের কথায় আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিলড্ কর্তা আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বসময় পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে রয়েছে অবিরাম লড়াই চালাচ্ছে, কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে।" দাস সমাজের গর্ভেই সৃষ্টি হয় সামন্ত-সমাজ। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র বিকাশ লাভ করে।

সামন্ততন্ত্রের চরম রূপ অবশ্য আমরা দেখতে পাই ইউরোপে একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। যেখানে রাজাই ছিলেন তত্ত্বগতভাবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক। এবং রাজাই ছিলেন সামন্ত স্তর বিভক্ত সমাজের শীর্ষদেশে।

রাজা সামন্তদের জমির মালিকানা প্রদান করেছিলেন। সামন্তদের মধ্যে অবশ্য ছোট বড় সামন্ত ছিল। কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থান ছিল এ সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে। তবে ইউরোপের যেহেতু রাজা সামন্তদের জমির মালিকানা দিয়েছিলেন, অতএব কৃষকও এখানে মালিক ছিল। যদিও রাজা ও কৃষকদের মাঝখানে ক্রমোচ্চভাবে অনেক সামন্ত জমির মধ্যস্বত্ব মালিকানা ভোগ করত। কালক্রমে ধনী কৃষকগণ সামন্ত প্রভুতে পরিণত হয়।

রাজ পরিবার এবং ভূস্বামীদের জমি কর্ষণ করত দাসগণ। এই দাসগণের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। ভূস্বামীরা দাস কৃষককে দিয়ে জমি কর্ষণ করাত এবং লোহার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল এবং অপরাপর কৃষি সাজসরঞ্জামের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। কালক্রমে অর্থনৈতিক গড়ন রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন হল সামন্ততান্ত্রিক। জমির উপর থেকে কৃষকদের সত্ত্বা হারাল। সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দেখা দিল আরও চরম দুর্দশা। একদিকে বৃহৎ ভূস্বামী অন্যদিকে ভূমিহীন দাস মজুর। সামাজিক নিরাপত্তাও হারাল সাধারণ মানুষ। সামাজিক সংগঠনগুলির উপর কর্তৃত্ব এল। সামন্ত প্রভুদের বর্বরতা আর সামাজিক সংগঠনগুলির ধ্বংস এই যুগে মানব সমাজের এক চরম সংকটের মুখে নিয়ে গেছিল।

ধীরে ধীরে উৎপাদনের শক্তি এমন এক জায়গায় পৌঁছাল যেখানে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিস্তার লাভ করল। এবং এই সময় সর্বপ্রথম উৎপাদনে কোন ভাবে অংশগ্রহণ না করেই গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালন ভার গ্রহণ করল এবং অর্থনৈতিক ভাবে সমস্ত উৎপাদনকে নিজের শাসনাধীনে আনল। এবং শোষণ আরও তীব্রভাবে শুরু করল। মার্কসের ভাষায়, সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণী বিরোধ শেষ হয়ে যায়নি। এই সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরণ···মধ্যযুগের ভূমিদাসদের ভিতর

থেকে প্রথম শহরগুলির স্বাধীন নাগরিকদের উদ্ভব হয়। এই নাগরিকদের মধ্যে থেকে আবার বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রথম উপাদানগুলি বিকশিত হল। আমেরিকা আবিস্কার ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণে উঠতি বুর্জোয়াদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে গেল। পূর্ব-ভারত, চীনের বাজার, আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপন. উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময় ব্যবস্থার তথা সাধারণভাবে পণ্যের প্রসার বাণিজ্যে নৌযাত্রায় শিল্পে দান করে অভূতপূর্ব একটি উদ্যোগ···।" লেনিনের কথায় "উৎপাদন শক্তির বিকাশের একটি রূপ থেকে তা পরিণত হয় শৃঙ্খলে। তখন আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল উপরি কাঠামোর সবখানিও ন্যূনাধিক অচিরাৎ রূপান্তরিত হয়ে থাকে।" এই ধনতান্ত্রিক সমাজে মালিক শ্রেণী আর মজুর শ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেতেরিয়াত এই শ্রেণীর জন্ম হয়। যাদের মূলত অস্তিত্ব ছিল নগর কেন্দ্রিক। উৎপাদনের মাধ্যম (যন্ত্র) গুলি ধীরে ধীরে শিল্প বিপ্লবের ফলে আরও উন্নত হতে থাকে এবং উৎপাদনের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটতে থাকে। চাহিদার চেয়েও উৎপাদন অধিক হল আবার অন্যদিকে উৎপাদনের মালিকানা রয়ে গেল মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর হাতেই। আধুনিককালে যার রূপ পাল্টে হল সাম্রাজ্যবাদী। উৎপাদন সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য বাজার চাই ফলে দেশ দেশান্তরে জুড়ে শুরু হল বাজার এবং উপনিবেশ স্থাপন। যদিও এরপরই জন্ম সমাজতন্ত্র সমাজের, তথাপি আমাদের বুঝতে হবে সমাজ ব্যবস্থার ধারাবাহিক পরিবর্তন। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের বহু সংগঠন বিলুপ্ত হয়েছে, নতুন জন্ম নিয়েছে, আদি সাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে দাস সমাজ, দাস সমাজ ভেঙ্গে সামন্ত এবং ধনতন্ত্র সমাজ সৃষ্টি হয়েছে ফলে সামাজিক রীতিনীতিও পাল্টেছে খুব স্বাভাবিক কারণেই।

সূত্র :

১) সমাজ বিজ্ঞানের শব্দ পরিচয় পৃঃ ২৬৫
২) সামাজিক প্রবন্ধ-ধর্ম-দর্শন-রাষ্ট্র-সমাজ বিষয়ক শব্দ টীকা পৃঃ ৩০৮
৩) সমাজ বিজ্ঞানের শব্দ পরিচয় পৃঃ ২৬৬
৪) ঐ

সমাজ গঠনের ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া

দলবদ্ধ হওয়া বা একত্রে মিলেমিশে কাজ করার প্রবণতা আদিম কাল থেকেই মানুষের মনে অনুভূত হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে, বেঁচে থাকার তাগিদেই। আদিম মানব যখন শিকারের আশায় বনাঞ্চলে, পাহাড়ে এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াতো, তখন তাদের কাছে অনেক সমস্যা ছিল। অতিকায় হিংস্র প্রাণী অথবা প্রকৃতির বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে এককভাবে জয়ী হওয়া যে সম্ভব নয় তা তারা বুঝেছিল। তাই বাঁচার তাগিদে জোটবদ্ধ হয়ে তারা অতিকায় প্রাণীর মোকাবিলা করত; প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার বিজ্ঞানভিত্তিক উপায় জানা না থাকায় দলবদ্ধভাবে প্রকৃতি দেবীকে পুজার্চনার মাধ্যমে তুষ্ট করার চেষ্টা করত।

একা একা অতিকায় প্রাণীর মোকাবিলা করা বা প্রকৃতির সৃষ্ট নানান দুর্যোগের বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম যথেষ্ট নয়, এই ভাবনা মানুষের মনে জাগ্রত হতে থাকলে একজন-দু'জন করে দলে পরিণত হয়ে কিছু কাজ সমাধান করার চেষ্টা করতে শুরু করে। যে কাজ দলের মধ্যে দিয়ে হবত সেই কাজ অনেক বেশি কার্যকরী হত। হিংস্র জন্তুর সঙ্গে দলবদ্ধভাবে লড়াই করার চেষ্টা যখন সার্থক হল, তখনই শুরু হল মানুষের দলবদ্ধতা।

প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রথম দলবদ্ধ হয়েছিল. কিভাবে প্রকৃতি ও হিংস্র প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ভাবনা শুরুর পরই মানুষ মানুষকে নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবল। তখনই শুরু হ'ল দ্বন্দ্ব। একদল আর একদলের উপর শারীরিক নিয়ন্ত্রণ কিভাবে রাখা যায় যেমন এই ভাবনা ছিল, তেমনি ভাবনা ছিল আহারাদি বা গোষ্ঠীর সদস্যকে রক্ষা করা। চাষবাস শুরু করার সাথে সাথেই মানুষ তার জমি. জমির ফসল, গৃহপালিত পশু ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। যদিও এই নিয়ন্ত্রণ. রাষ্ট্র উৎপত্তির আগে এক শ্রেণীর উপর আর এক শ্রেণীর ছিল না। সাধারণভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী মানুষটিই অন্য সকল দুর্বল মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখত। আদিমকালে এই ধরণের

সমাজে কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সংগঠন কিছু ছিল না। সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতি ও হিংস্র প্রাণীকে নিজের কব্জায় নিয়ে আসতে থাকলে, মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকলে, জমি থেকে উৎপাদন শুরু হতে থাকলে, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার শুরু হতে থাকলে, মানুষ জোটবদ্ধ হতে থাকে।

প্রাণীর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব, তাই জন্তু এবং মানুষের মধ্যে জোটবদ্ধতা সৃষ্টি হয়নি বা জন্তুদের মধ্যে সংগঠন সৃষ্টি হয়নি। যদিও প্রকৃতিরও কিছু স্বভাবগত কারণে সব শুয়োরের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় বা সব হস্তীর মধ্যেও দলীয় মনোভাব দেখা যায়।

সম্পত্তি আবির্ভাবের সাথে সাথেই মানুষ মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। শ্রেণীর উপর শ্রেণীর কর্তৃত্বের শুরুই দলবদ্ধতার জন্ম দেয়। মানুষের জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা জাগে। দুর্বল শ্রেণীর উপর সবলের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লড়াকু মনোভাব গড়ে ওঠে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য চারিদিকে ছোটাছুটি শুরু করে, গুঞ্জন করে, কানাকানি করে, গোপন ও প্রকাশ্য আলোচনায় সামিল হয়, লড়াই করার সবরকম প্রয়াস সৃষ্টি করে। এটাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি। যেমন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার জন্য মানুষ জোটবদ্ধ হয়। বর্ষার প্রাক্কালে নদীর বাঁধগুলো একবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। নিজের খড়ের ছাউনিটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেয়। আবার তেমনি প্রকৃতিকে কাজে লাগাবার জন্য ঠিক একই সময় জমিতে লাঙল দিতে শুরু করে, জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা করার চেষ্টা করে এবং এইভাবেই মানুষ তার জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়। নিম্নস্তর থেকে বহুমুখী জ্ঞানে প্রবেশ করে।

মার্কস লিখেছেন, 'মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজ অধিকারে আনার জন্য প্রকৃতিরই একটি শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড় করায় এবং হাত, পা, মাথা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—তার দেহের প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে সবল করে তোলে। এইভাবে বাহ্যিক জগতকে প্রভাবিত করে ও পরিবর্তিত করে মানুষ একই সঙ্গে

স্ব-প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আনে। তার সুপ্ত শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে এবং তার প্রভাবানুসারে কাজ করতে বাধ্য করে'।[১]

আরো ভালোভাবে বাঁচার তাগিদে মানুষ তার প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও দক্ষতা, এক কথায় উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে উন্নত করার প্রচেষ্টা করে। ফলে উৎপাদিকা শক্তিগুলিও হয়ে পড়ে, উৎপাদনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গতিশীল ও বৈপ্লবিক উৎপাদন।[২]

মানুষ উৎপাদন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হবার পরই উপলব্ধি করে, সংগঠিত হবার কারণ সে বুঝতে পারে, প্রাকৃতিক নিয়মবিধির বৈশিষ্টসমূহ, প্রকৃতির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক সে বুঝতে পারে এবং উৎপাদন বিষয়ের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ সে কম বেশি বুঝতে পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিশেষ সম্পর্কসমূহ।

মানুষ তার জীবন শুধুমাত্র উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখে না। সে রাজনৈতিক জীবনে, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় এবং মানুষের ব্যবহারিক সমস্ত জীবনেই অংশগ্রহণ করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে লড়াইয়ের। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে যখন শোষণ করে, অত্যাচার করে, অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে তখনই মানুষ বিদ্রোহ করে। তার জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়, উপলব্ধি করে শোষণ, এবং প্রতিকারের জন্য শুরু করে সংগঠন। এই সংগঠনই অন্যান্য আর সকল সংগঠনের চেয়ে প্রধান।

সমাজের ক্রমবিকাশ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ চিনতে শিখেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীকে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টির গোড়া থেকেই তাই আজ পর্যন্ত চলছে মানুষের অবিরাম সংগ্রাম। এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীর সংগ্রাম। এই সংগ্রামের সূচনা আছে কিন্তু অন্তিম নেই। কেবলমাত্র চরিত্র পাল্টাতে পারে।

বহুকাল যাবৎ মানুষ শোষিত হয়ে এসেছে বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের দ্বারা। অন্যায় আর অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করেছে।

বিদ্রোহ করার কোন সংগঠিত প্রয়াস আদিকালে বিশেষ দেখা যায়নি। কিন্তু যখন এই শোষণ তীব্র হ'তে লাগল এবং গোটা মনুষ্য সমাজ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে উঠল, তখনই শুরু হয় সংগঠিত হবার প্রবণতা। মানুষ সৃষ্টি করল বিশেষ জ্ঞান। সচেতন হয়ে মানুষ শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তার সামাজিক অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই জ্ঞান অর্জন করে এবং ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে থাকে।

সুতরাং মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া কোন নতুন ব্যাপার নয় বা যে কারণে মানুষ সংগঠিত হতে চায়, তাও কোন নতুন ব্যাপার নয়। মানুষ প্রথমে হিংস্র জন্তুর বিরুদ্ধে; পরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং শেষে শ্রেণীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। যদিও মানুষ সবকিছুকেই আজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। যেমন এক শ্রেণীর মানুষ সমাজের সবকিছু ভোগ করে এবং অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষকে বঞ্চিত করে শাসন চালায়। অনবরতই চলছে লড়াই। সঙ্ঘবদ্ধ হবার আপ্রাণ চেষ্টা। মানুষ যদি শান্ত পরিবেশে থাকত, সমস্যার সম্মুখীন হতে না হত- তাহলে হয়ত শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্তও হতে হত না। যেমন কথায় বলে 'হোঁচট না খেলে চোখ খোলে না', 'মার না খেলে মার দেওয়া যায় না', 'বিপদে না পড়লে শিক্ষা হয় না'। ইতিহাসের নানান সময় নানান ধরণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস ঘটেছে। কখনো তারা ব্যর্থ হয়েছে আবার কখনো সাফল্য অর্জন করেছে। ব্যর্থতার কারণই সাফল্য, এ সত্যও প্রমাণ হয়ে গেছে। সংগঠিত হওয়া কোন নিছক আনন্দ-বিনোদন নয় একথাও মানুষ জেনেছে। বাঁচার জন্যই সংগ্রাম আর সংগঠন। সংগ্রাম একা একা হয় না। সমাজ ব্যতীত সংগ্রামের কোন মূল্য নেই। মানুষ ছাড়া সংগঠন হয় না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে কেবল মানুষই মানুষের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। একটি পরিবার একটি সংগঠন, আবার অনেক পরিবার মিলেও একটি শ্রেণী সংগঠন। স্ব স্ব পেশায় যুক্ত মানুষদের স্ব স্ব সংগঠন। সম্পত্তির মালিক ও শাসক শ্রেণীর সংগঠনের পাশাপাশি শোষিত গরীব শ্রেণীর সংগঠনও গড়ে ওঠে। সংগঠন সৃষ্টির মূল কেন্দ্র উৎপাদন-কর্মকাণ্ড ও তার মালিকানাকে কেন্দ্র করে। যদি সমাজে উৎপাদনের মালিক সকল

মানুষই হত, তাহলে হয়ত শ্রেণী বিরোধের সংগঠনই গড়ে উঠত না। শ্রেণী সৃষ্টির সাথে সাথেই সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেছে। শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলেই সংগঠিত হবার ইচ্ছা জেগেছে।

মানুষের সমাজে সমস্যার সৃষ্টি এবং প্রতিকার করার জন্য এই দুই সংগঠন তৈরী হয়েছে। এক সংগঠন শাসন চালানোর জন্য আর এক সংগঠন শাসনের বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য। এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। এছাড়াও মানুষ সামাজিক বিকাশ ঘটানোর জন্য বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ইত্যাদিরও বিকাশ ঘটিয়েছে। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের পাশাপাশি বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক সংগঠনও গড়ে তুলেছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সংগঠিত বা সংগঠন গড়ার প্রবণতা আজকের নয়। সংগঠিত হওয়া ছাড়া মানুষের বাঁচার কোন দ্বিতীয় পথ নেই। আদি সমাজে পশুপালন চাষবাস করতে শেখায় মানুষকে সভ্যতার পথে অগ্রগতির সূচনা ঘটায়। জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সব উপকরণ সে প্রকৃতির উদার দানস্বরূপ গ্রহণ করে না, জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের জন্য এবং উৎপন্ন সামগ্রী বিনিময়ের জন্য অন্যান্য মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় মিলিত হয়ে এগুলি সে সংগ্রহ করে কেবলমাত্র জীবন ধারণের উপকরণ-উৎপাদন ও বিনিময়ের জন্য মিলিত হয়েই মানুষ তার অন্যান্য সামাজিক কাজকর্ম আরও ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারে। মানুষ তার ন্যূনতম চাহিদা যখন পূরণ করে তখনই সে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ইত্যাদি গড়ার জন্য আগ্রহী হয়। অর্থাৎ একদিকে উৎপাদন বণ্টন বিনিময়ের জন্য শ্রেণী সংগ্রাম চালায় অন্যদিকে ভাল সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য নানাবিধ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলে।

কারণ মানুষ যেমন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে না এবং একাকী কোন কাজ করতে পারে না সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, এবং সেই কারণেই সমাজে পরিব্যাপ্ত শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে চিন্তা করে না; বাস্তবিকপক্ষে গমনচিন্তা সে করতেও পারে না।

এংগেলস্ লিখেছেন : সমস্ত অতীত ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস ; সমাজের এই যুযুধান শ্রেণীগুলিও চিরকাল উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির, অর্থাৎ তাদের সময়ের আর্থিক অবস্থার ফল, অতএব সবসময়ে সমাজের অর্থ-নৈতিক কাঠামোই গঠন করে প্রকৃত বুনিয়াদ, যার ভিত্তিতে আমরা একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের আইনী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা তার ধর্মীয়, দার্শনিক ও অন্যবিধ ভাবনার উপরিসৌধটার ব্যাখ্যা বার কবতে পারি।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের যে গুরুত্ব তার স্বীকৃতি থেকেই এই উপলব্ধি আসে যে, পূর্ববর্তী যুগগুলিতেও একইরকমভাবে শ্রেণীসংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটাও বুঝতে পারা যায় যে, বাস্তবিকপক্ষে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে যাবার পর থেকেই সমগ্র অতীত ইতিহাস হ'ল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

আর এই শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি মার্কস উৎপাদন কর্মের মাধ্যমে দেখান. উৎপাদন কর্মে মানুষ শুধু প্রকৃতির ওপর নয়, পরস্পরের ওপরেও ক্রিয়া করে। বিশেষ ধরণের সহযোগিতা করে এবং পরস্পরের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি ক'রে তবেই তারা উৎপাদন করে। উৎপাদন করার জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কেবলমাত্র এইসব সামাজিক সংযোগ ও সম্পর্কের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হয় প্রকৃতির ওপর তাদের ক্রিয়া অর্থাৎ উৎপাদন।

তাঁরা আরও দেখান যে, শ্রমিক শ্রেণী যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় না করে, পুঁজিপতিদের যদি সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত না করে এবং তাদের প্রতিরোধ যদি গুঁড়িয়ে না ফেলে, তাহলে পুঁজিবাদ থেকে রেহাই পাওয়া এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা দুই-ই অসম্ভব। তাঁরা এটাও দেখান যে পুরনো পৃথিবীকে পরাভূত করার জন্য এবং নতুন শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব একটি দল অবশ্যই থাকা দরকার।

সমাজ গঠিত হয় সচেতন মানুষকে নিয়ে এবং সমাজে যা কিছুর উদ্ভব হয় তা সবই মানুষের সচেতন কর্মের ফল।

এংগেলস্ লিখেছেন, একদিক থেকে সমাজ এবং প্রকৃতির বিকাশের ইতিহাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। ...প্রকৃতির ক্ষেত্রে কেবল অন্ধ সচেতন শক্তিগুলি পরস্পরের উপর সক্রিয়....পক্ষান্তরে, মানব সমাজে প্রতিটি কর্মকর্তা চেতনাসম্পন্ন, তারা সংকল্প নিয়ে বা আবেগবশে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে ক্রিয়াশীল, সচেতন উদ্দেশ্য ছাড়া, বাঞ্ছিত লক্ষ্য ছাড়া এখানে কোন কিছুই ঘটে না।

বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক। প্রাক্তন সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কগুলির এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংস সাধনের ফলেই একমাত্র এই ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পেরেছিল, আর যে মানুষেরা এই বিপ্লব করেছিল তারা স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর মতো লক্ষ্যের পেছনে সমবেত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আর্থিক কাঠামোয় তাদের নিজস্ব অবস্থানের দরুণ কৃষক, শহুরে শ্রমিক আর উঠতি বুর্জোয়ারা সকলেই তাদের বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে হতাশ হয়েছিল। ফলতঃ সামন্ত-শাসনাধীনে তারা সকলেই ছিল নির্যাতিত। সেই কারণেই তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাদের স্বাধীনতা নামক লক্ষ্যের মধ্যে এটাই প্রকাশ পেয়েছিল। তাদের কর্মই সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা চুরমার করেছিল। কিন্তু পরিণতি যা হল তা বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশেরই অনভিপ্রেত ছিল। কারণ যে মুহূর্তে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা চূর্ণ করা হল সে মুহূর্ত থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিকাশের অবাধ সুযোগ এসে গেল। তাই কারুর কোনও অভিপ্রায়ের অপেক্ষা না রেখেই আর্থিক বিকাশের নিয়মাবলী পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়। এবং ধীরে ধীরে তাও মানুষের কাছে অযোগ্য, অন্যায়, অযৌক্তিক ও অত্যাচারী বলে মনে হতে লাগল এবং এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং পরিবর্তনের জন্য মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও কার্য করে এসেছে।

স্তালিন লিখেছেন ঃ মানুষ যদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ও ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ হল এই যে, মানুষ তার

প্রয়োজন চরিতার্থ করবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং সেই অনুযায়ী তার অর্থ-নৈতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ সমষ্টিগতভাবে, আদিম সাম্যবাদের ভিত্তিতে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে; সেই সময় তাদের সম্পত্তি ছিল সাম্যবাদী সম্পত্তি, আর তাই তখন তারা 'আমার' ও 'তোমার' মধ্যে কদাচিৎ পার্থক্য করেছে; তাদের চেতনা তখন ছিল সাম্যবাদী। তারপর একটা সময় এল যখন 'আমার' ও 'তোমার' মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যের বোধ সঞ্চারিত হল উৎপাদন প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে; এবং সম্পত্তিও সে সময়ে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত চরিত্র পরিগ্রহ করল, আর তাই মানুষের চেতনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ব্যপ্ত হল। তারপর একটা সময় এসেছে; অর্থাৎ বর্তমান সময়, যখন উৎপাদন আবার সামাজিক চরিত্র পরিগ্রহ করেছে, আর তার ফলে সম্পত্তিও শীঘ্রই সামাজিক চরিত্র পরিগ্রহ করবে এবং ঠিক এই কারণেই মানুষের চেতনা সমাজতন্ত্রের আদর্শে ক্রমশই সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। ...প্রথমে বাস্তব অবস্থা বদলায় এবং তারপর মানুষের চিন্তা অভ্যাস, রীতিনীতি ও বিশ্ববীক্ষা তদানুযায়ী বদলায়।[৩]

অতএব, সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ..আমরা বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক ভাবধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেখতে পাই ..আমরা দাসব্যবস্থার সমাজে এক বিশেষ ধরণের সামাজিক ভাবধারা দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেখি আবার সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থায় অন্য রকম এবং পুঁজিবাদের আমলে আর একরকম দেখি। সমাজে যে সত্তা, জীবনযাত্রা পদ্ধতির যে ব্যবস্থা, তদানুসারেই সেই সমাজের চিন্তা, ভাবাদর্শ, রাজনৈতিক ধারণা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।[৪]

স্তালিন আরও লিখেছেন, নতুন সামাজিক চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শ তখনই দেখা দেয় যখন জীবনযাত্রা ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে সমাজের নতুন সমস্যা ও কর্তব্য এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু একবার দেখা দেবার

পর এসব নতুন চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শ খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের এই শক্তি সেসব নতুন সামাজিক কর্তব্যসিদ্ধিকে সাহায্য করে, সমাজ প্রগতিকে সাহায্য করে। ঠিক এখানেই নতুন ধারণা, নতুন মতবাদ, নতুন রাজনৈতিক চিন্তা ও নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যে প্রচণ্ড সংগঠনী, সংহতি সাধনকারী ও রূপান্তরকারী মূল্য আছে, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫]

জীবনযাত্রা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে যে নতুন কর্তব্য হাজির হয় তা সম্পাদনের জন্য এই ধারণা ও তত্ত্ব অপরিহার্য। ধ্যান-ধারণা ছাড়া জনগণ সঠিক কাজ করতে পারে না।

মার্কস লিখেছেন, মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজ অধিকারে আনার জন্য প্রকৃতিরই একটি শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড় করায় এবং হাত, পা, মাথা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার দেহের প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে সচল করে তোলে। এইভাবে বাহ্যিক জগৎকে প্রভাবিত করে ও পরিবর্তিত ক'রে মানুষ একই সঙ্গে স্ব-প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আনে। তার সুপ্ত শক্তিগুলিকে সে জাগিয়ে তোলে, এবং তার প্রভাবানুসারে কাজ করতে বাধ্য করে।[৬]

উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি করে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মানুষ সর্বদা কিছু তাৎক্ষণিক সুবিধা অর্জন করতে চেয়েছে। কিন্তু এই উন্নতি ও বিকাশের যে বাস্তব বৈপ্লবিক সামাজিক ফলাফল তা পরিকল্পনা করার বা অভিপ্রায় করার ধারে কাছেও সে কখনো যায় নি। অথচ এই উন্নতিগুলিই উৎপাদিকা শক্তির ব্যাপকভাবে নতুন রূপে বিকাশের পথ সুগম করে যার ফলে আবার উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যথাযথ পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

উদাহরণস্বরূপ, প্রথম যখন যন্ত্রশিল্পের সূচনা করা হল, তখন তার উদ্ভাবকদের বিশাল বিশাল নতুন নতুন উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টির কোন পরিকল্পনা ছিল না। তারা শুধু নিজেদের তাৎক্ষণিক সুবিধার সন্ধানে ছিল। যন্ত্রশিল্প চালানোর জন্য তারা মজুর-শ্রমিক ভাড়া করতে আরম্ভ

করে। অন্যভাবে বলা যায় তারা পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক গড়তে আরম্ভ করে। তাদের কোন উচ্চাকাঙ্খী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুঁজিবাদ গড়বার পরিকল্পনা ছিল বলে তারা এ কাজ করেনি, করেছিল এই জন্য যে যন্ত্রযোগেও বহুল পরিমাণে উৎপাদন চালানোর এটিই ছিল প্রকৃষ্ট পন্থা।

সুতরাং কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা নয়, স্বতঃস্ফূর্ত ও মানুষের ইচ্ছা নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক কর্মই প্রথমে উৎপাদন শক্তির উন্নতি, পরে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন আসে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির যেমন যেমন উন্নতি হয় এবং সেই উন্নতির তালে তাল মিলিয়ে যেমন যেমন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তেমনিভাবে আবির্ভূত ও বিকশিত হয় বিভিন্ন শ্রেণী।

আদিম সাম্যবাদের শেষ থেকে সমাজতন্ত্রের বিজয় পর্যন্ত সমাজ সর্বদা শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত থেকেছে, মুষ্টিমেয় শোষক সম্প্রদায় জনগণের কাঁধে ভর ক'রে জীবন কাটাতে সক্ষম হয়েছে। শোষক শ্রেণী শোষিতের প্রতিরোধ দমন করেছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শোষক শ্রেণীও ভিন্ন শোষণ পদ্ধতির প্রতিযোগিতা থেকে স্বকীয় শোষণ পদ্ধতিকে রক্ষা করেছে। সংখ্যালঘুর দখলে ও নিয়ন্ত্রণে বাকী সমাজকে দমন করার একটি বিশেষ সংগঠন ছিল। সেই সংগঠনের নাম 'রাষ্ট্র'।

রাষ্ট্রই সমগ্র সমাজ নয়। রাষ্ট্র সমাজের একটি বিশেষ সংগঠন, যা নির্যাতন ও দমন করার ক্ষমতার অধিকারী এবং যার কাজ হ'ল প্রচলিত সামাজিক শৃঙ্খলা নিরাপদে বজায় রাখা। রাষ্ট্র স্বৈরতান্ত্রিক, সামরিক, একনায়কতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক যে কোন ধরণের হোক না কেন, রাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হ'ল সমাজের অধিকাংশের ওপর বলপ্রয়োগে বাধ্যবাধকতা চাপানোর উপায়গুলি সেনা পুলিশ ইত্যাদি বিশেষভাবে সংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে এই বাধ্যবাধকতা আদায় করা হয়।

বৈরী শ্রেণীগুলিতে সমাজ বিভক্ত হলে পরেই এরকম একটি বিশেষ সংগঠন আবশ্যক হয়ে পড়ে। তখন থেকেই সামাজিক বৈরীতা-প্রসূত সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে প্রভূত শক্তি ও প্রাধিকার সম্বলিত একটি বিশেষ ক্ষমতারূপে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সমাজে প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এঙ্গেলসের কথায়, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অনন্তকালব্যাপী নয়। এমন সব সমাজ ছিল রাষ্ট্র ছাড়াই যাদের চলে যেত, যাদের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে যখন অনিবার্যভাবে সমাজে শ্রেণীবিভাগ এল, এই বিভাগের জন্যই রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। [৭]

রাষ্ট্রের উদ্ভব যেহেতু শ্রেণী-বৈপরীত্য সামলে রাখার জন্য অথচ রাষ্ট্র যেহেতু গড়ে উঠেছে ঠিক এই শ্রেণীসংঘাত থেকেই, তাই সাধারণতঃ রাষ্ট্র হ'ল সবচেয়ে পরাক্রান্ত, অর্থ-নৈতিকভাবে প্রভুত্বকারী শ্রেণীটির রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে এ শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিকভাবেও 'প্রভুত্বকারী' শ্রেণী। এবং এইভাবে নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন ও শোষণের নতুন উপায় হাতে পায়....শুধু এই নয় যে; কেবল প্রাচীন ও সামন্ত রাষ্ট্রগুলিই ছিল ক্রীতদাস ও ভূমিদাস—সংস্থা, আধুনিক প্রতিনিধিত্ব-মূলক রাষ্ট্রও হ'ল পুঁজি কর্তৃক মজুরী-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। [৮]

সমাজের পরিবর্তনগুলিতে দেখা গেছে একটি শোষক শ্রেণীর জায়গায় অন্য একটি শোষক শ্রেণী এসেছে। দাস প্রভুর স্থানে সামন্তপ্রভু, সামন্ত প্রভুর স্থানে পুঁজিপতি এবং এইভাবে একটি শোষণ ব্যবস্থার বদলে অন্য একটি শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রভুত্ব এবং উৎপাদনের সামাজিক শক্তিবৃদ্ধি সমগ্র মানব প্রগতির মূল। প্রকৃতির ওপর আধিপত্যের প্রসার ঘটিয়ে মানুষ শুধু যে তাঁর বৈষয়িক চাহিদা পূরণ ক'রে তাই নয়, সে তার ধ্যান-ধারণারও প্রসার ঘটায়। জগৎ সম্পর্কিত জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলে এবং নানা বৃত্তি ও প্রতিভার উন্মেষ ঘটায়

(মরিস কর্ণফোর্থ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ)। ঠিক এই কারণেই শ্রমজীবি জনগণ একমাত্র বর্তমান যুগেই এমন একটি অবস্থায় এসেছে যেখান থেকে তারা নিজেরাই সমাজকে শাসন এবং সমাজের সাধারণ পরিচালনভার ও নেতৃত্ব অধিগ্রহণ করতে সক্ষম।

জনগণ যেমন নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ না হয়ে উৎপাদন চালাতে পারে না, ঠিক তেমনি যথাযথ মত ও প্রতিষ্ঠান ছাড়া ঐ সমস্ত উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রাখা বা সুদৃঢ় করা যায় না। তাই সামাজিক উৎপাদন চালানোর জন্য এবং আনুষঙ্গিক উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সুদৃঢ় করার জন্য এবং উন্নত করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন, রাজনৈতিক ও আইনগত মত ও প্রতিষ্ঠানের একটি উপরিসৌধ। রাষ্ট্র যেমন তার বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তি রক্ষা করার চেষ্টা করে তেমনি রাজনৈতিক ও আইনগত মত ও প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে ও সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

সমাজ যখন বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে ইতিহাস যখন হয়ে যায় শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, তখন শ্রেণী স্বার্থই হয় মতাদর্শের প্রধান প্রেরণা। প্রতিটি মতাদর্শ হয়ে পড়ে একটি শ্রেণীর মতাদর্শ এবং যত পরোক্ষভাবেই হোক না কেন তা একটি শ্রেণীর জীবনযাপন পদ্ধতিকে প্রকাশ করে এবং অন্যান্য শ্রেণীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারই সেবা করে। যে কোনো যুগের আধিপত্যশীল মতাদর্শ হ'ল শাসক শ্রেণীর মতাদর্শ।

মাওয়ের মতে, মানুষের জ্ঞান প্রধানতঃ তার বৈষয়িক উৎপাদনের কর্মকাণ্ডের ওপরেই নির্ভর করে, যার মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ সে প্রাকৃতিক নিয়মবিধির (Laws of nature) বৈশিষ্ট্যসমূহ, তার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক সে বুঝতে পারে, এবং উৎপাদন বিষয়ের কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ সে কম-বেশি বুঝতে পারে মানুষের বিশেষ সম্পর্কসমূহ। উৎপাদন বিষয়ে কর্মকাণ্ড ব্যতীত এই জ্ঞানোপলব্ধি তার হতেই পারে না।

মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র উৎপাদন কর্মেই ব্যাপৃত থাকে না, থাকে অন্যান্য কর্মকাণ্ডের নানা ধরণের মধ্যেও বিধৃত, যেমন, শ্রেণী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক জীবনে বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় সংক্ষেপে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সমাজের ব্যবহারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে যোগ দেয়। শ্রেণী সমাজে প্রত্যেকেই বিশেষ শ্রেণীর সদস্যরূপে বাস করে এবং প্রতিটি চিন্তা পদ্ধতিতে, কোনরকম ব্যতিক্রম ব্যতীতই একটি শ্রেণী ছাপ পড়ে থাকে।

অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথেই, উৎপাদন শক্তির সাথে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করে, সংগঠিত হবার চেষ্টা করে। বিশেষ ক'রে শ্রেণী সমাজে যেখানে সমাজ ধীরে ধীরে জটিল থেকে আরো জটিলের দিকে ঝুঁকেছে। তারই মধ্যে একটি ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমাজে দু'টো প্রধান ধারা বইছে একটি শাসক অন্যটি শোষিত। অত্যাচারী, অন্যটি অত্যাচারিত শ্রেণী। একদিকে শাসক অত্যাচারী শ্রেণীগুলি নিজেদের সংগঠিত করেছে এবং টিঁকে থাকার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে শাসিত, অত্যাচারিত শ্রেণীরা সংগঠিত হয়ে শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।

স্তালিনের কথায়, যতই সমাজ বিকাশ লাভ করতে থাকে ততই সমাজের জটিলতা ভেদ ক'রে প্রধান দু'টো ধারা বেরিয়ে আসে, ততই এই জটিল সমাজ অত্যন্ত স্পষ্ট ধারায় দু'টো প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে ধনতান্ত্রিক শিবির ও শ্রমিক শ্রেণীর শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

স্তালিন আরো বলেন, একটা সময় ছিল যখন সমাজে 'শান্তি ও নির্বিঘ্নতা' বিরাজ করত। সেকালে এইসব শ্রেণী ও তাদের শ্রেণী সংগঠনগুলির চিহ্ন দেখা যেত না। সে সময়েও অবশ্যই সংগ্রাম চলতো, কিন্তু সে সংগ্রামে থাকতো স্থানিকরূপ, সাধারণ শ্রেণীসংগ্রামের রূপ তা পরিগ্রহ করতো না; ধনিকদের নিজেদের কোন সংগঠন ছিল না এবং প্রত্যেক ধনিকই যার যার 'নিজের' শ্রমিকদের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতো। শ্রমিকদেরও কোন ইউনিয়ন ছিল না, এবং তার ফলে,

প্রত্যেকটি কারখানার শ্রমিকদের নিজেদেরই শক্তির ওপর নির্ভর করতে হতো।

কিন্তু এটাও অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যতই সমাজ বিকাশ লাভ করতে থাকে, ততই এই জটিলতা ভেদ করে প্রধান দুটো ধারা বেরিয়ে আসে, ততই এই জটিল সমাজ অত্যন্ত স্পষ্ট ধারায় দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে—ধনতান্ত্রিক শিবির ও শ্রমিক শ্রেণীর শিবিরে—বিভক্ত হয়ে যায়। মার্কস 'কমিউনিষ্ট ইশ্‌তাহারে' লিখেছেন, 'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গিয়াছে তাহাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড কর্তা ও কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হইয়া থাকিয়াছে, অবিরাম লড়াই চালাইয়াছে, কখনও আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে, প্রতিবার এই লড়াই শেষ হইয়াছে সমগ্র সমাজের বিপ্লবী পুর্নগঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।'

"সমস্ত সমাজের ধ্বংসস্তুপ হইতে যে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের জন্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ শেষ হইযা যায় নাই। এই সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করিয়াছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরণ। গোটা সমাজ ক্রমেই দুইটি বিশাল শত্রুশিবিরে ভাগ হইযা পড়িতেছে, ভাগ হইতেছে পরস্পরের সম্মুখীন দুইটি বিরাট শ্রেণীতে – বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত"।

বর্তমান শ্রেণীসমাজে প্রত্যেক শ্রেণীই নিজ নিজ শিবির গঠন করেছে। প্রধান দুই শিবির এবং অন্যান্য সকল শ্রেণী স্ব স্ব স্বার্থ অনুযায়ী দুই শিবিরের চারপাশে জড়ো হচ্ছে।

শ্রেণী সমাজে শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই রাজনৈতিক লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়। এক শ্রেণীর সঙ্গে আর এক শ্রেণীর সংগঠিত লড়াই, এই লড়াই শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়। মানব সমাজে তাই শ্রেণী সংগ্রামের জন্য 'সংগঠন'

একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে কিরূপ সংগঠন মানুষকে তার অবস্থার পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে? অবশ্যই বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন। এবং অবশ্যই নির্দিষ্ট মতবাদ থাকাও আবশ্যক। এই লড়াই মানুষ বহুকাল থেকেই করে আসছে।

মার্কস বলেছেন, প্রত্যেকটি শ্রেণী সংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রাম। তার অর্থ হচ্ছে, আজ যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চলছে শ্রমিক শ্রেণী ও ধনিকদের মধ্যে, আগামীকাল তারা বাধ্য হবে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করতে এবং এইভাবে তাদের পারস্পরিক শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের মধ্যে এই লড়াই দু'টি রূপ পরিগ্রহ করছে। ধনিকদের রয়েছে তাদের বিশেষ ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং এই স্বার্থ রক্ষার জন্যই রয়েছে তাদের আর্থনীতিক সংগঠনসমূহ। কিন্তু তাদের এই বিশেষ ব্যবসায়িক স্বার্থ ছাড়াও রয়েছে তাদের এক সাধারণ শ্রেণী স্বার্থ, অর্থাৎ ধনতন্ত্রকে শক্তিশালী করার শ্রেণীস্বার্থ। এবং এই সাধারণ স্বার্থটি রক্ষার জন্যই তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে এবং তারজন্য চাই তাদের এক রাজনৈতিক পার্টি। বিপরীত দিকে, শ্রমিক শ্রেণীর আজকের শ্রেণীআন্দোলনে একই ধরণের জিনিস দেখা যায়। শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকা-স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ গড়ে উঠেছে এবং এই সংগঠনগুলো মজুরী বৃদ্ধি, খাটুনির সময় কমানো প্রভৃতি নিয়ে লড়াই করছে। কিন্তু এইসব জীবিকা রক্ষা ছাড়াও শ্রমিকদের সাধারণ শ্রেণীস্বার্থও আছে, যেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ও অবিভক্ত শ্রেণী হিসেবে যে পর্যন্ত না রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়। সেই কারণে শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক সংগ্রাম করতে হবে; সেজন্য তার চাই একটি রাজনৈতিক পার্টি। যার কাজ হবে তার রাজনৈতিক আন্দোলনের আদর্শগত নেতৃত্ব দেওয়া।

মানব সমাজ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যা দিয়ে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য পরিকল্পনা ও উৎপাদন প্রনালী-গুলিকে আরও নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই সমাজবদ্ধ হয়েছে উৎপাদন ও বণ্টনের নিয়মনীতিকে ভিত্তি করেই বিকাশের বিভিন্ন পর্বে নানান ধরণের সমাজ সংগঠন গড়ে উঠেছে। যার মূল চালিকা শক্তি হল অর্থনৈতিক নিয়মাবলী। সে কারণে মার্কস বলেছিলেন যে অর্থনীতিই সব ধরণের সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কারণ মানুষকে প্রথমেই তার মিলিত শ্রমে আহরিত সম্পদের বিনিময়, বণ্টন, ভোগের ব্যবস্থা করতে হয়েছে আর এর জন্য যে নিয়মনীতি বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় সে গড়ে তুলেছে তাকে কার্যকরী করা, সকলের নিকট তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করতে হয়েছে। দর্শন, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাই বলি না কেন তা গড়ে উঠেছে এই অর্থনৈতিক নিয়মাবলীকে ভিত্তি করেই। এঙ্গেলস তার ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রবন্ধে লিখলেন, "ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের শুরু এই প্রতিজ্ঞা থেকে যে, মনুষ্য জীবনের ভরণপোষণের উপায়ের উৎপাদন এবং উৎপাদনের পর উৎপাদিত বস্তুর বিনিময়—এই হলো সমস্ত সমাজ কাঠামোর ভিত্তি এবং ইতিহাসে আবির্ভূত প্রতিটি সমাজে ধন বণ্টনের ধরণ এবং শ্রেণী ও বর্গে সমাজের বিভাগ কি উৎপাদন হলো, কি ভাবে উৎপাদিত হলো এবং কি ভাবে উৎপন্নের বিনিময় হলো, তার ওপর নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের শেষ সন্ধান করতে হবে মানুষের মস্তিষ্কে নয়, চিরন্তন সত্য ও ন্যায় নির্ণয়ের কোন ব্যক্তির উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে নয়, উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরণের পরিবর্তনের মধ্যে। তার সন্ধান করতে হবে দর্শনের মধ্যে নয়, প্রতি যুগের অর্থনীতির মধ্যে"। সুতরাং যে কোন সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝতে হলে সেই সমাজের অর্থনৈতিক নিয়মাবলীকে জানা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আদিমকাল থেকেই মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নিত্য নতুন হাতিয়ার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিস্কার ঘটিয়েছে। ধীরে ধীরে সমাজে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগে এসেছে নানান পরিবর্তন। অর্থনৈতিক নিয়মেও এসেছে পরিবর্তন। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের সমাজ ব্যবস্থারও উদ্ভব ঘটেছে। মোটামুটি পাঁচ ধরণের সমাজ ব্যবস্থা উল্লেখ করা যেতে পারে; আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা, দাস ব্যবস্থা, ভূমিদাস ব্যবস্থা বা সামন্ততন্ত্র, মজুরি দাস ব্যবস্থা বা ধনতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, যা বর্ধিত সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার অংশ বিশেষ। প্রথম ও শেষের অংশটা বাদ দিলে বলা যায় সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক নিয়ম ছিল এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণীর উপর শোষণ। অর্থাৎ এক শ্রেণীর কর্তৃত্ব থাকবে সমস্ত সম্পদ ও মানুষের শ্রমের উপর আর অন্য শ্রেণীর থাকবে শ্রম ক্ষমতা (যা নিয়ন্ত্রিত অন্য শ্রেণী কর্তৃক)। কোন প্রকারে যাতে অন্য শ্রেণী (যাদের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই) পশুর মতন বেঁচে থাকতে পারে।

প্রাচীন সমাজ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে ধরণেরই সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হোক না কেন শ্রেণীশোষণ বন্ধ হয়নি। আর বন্ধও হতে পারে না কোন প্রকার বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া ছাড়া। তবে ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় সমাজ ব্যবস্থা পাল্টাবেই। শ্রেণীশোষণ স্তব্ধ হবেই। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের ক্রমবর্ধমান যে প্রক্রিয়া চলছে তাতে স্পষ্ট হয় যে, মানুষ নিজেকে সংগঠিত করছে ব্যক্তি নয়, শ্রেণীরূপে অর্থনৈতিক মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে। মার্কসের মতে, অর্থনৈতিক মুক্তি সমাজ উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তিনি বর্ণনা করে বলেন, যন্ত্রবিদ্যার প্রসার অথবা সামাজিক বস্তুতান্ত্রিক পদক্ষেপই রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সমাজের অপরাপর পরিবর্তনের সূচনা করে। ধনতান্ত্রিক সমাজই উন্নয়নের শেষ ধাপ নয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ যেমন ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়েছিল তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজও একদিন সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হবে। বিকাশের গতিপথে, যখন শ্রেণী পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন সমস্ত জাতির এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত

হবে, তখন সরকারী শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। সঠিক অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শক্তিমাত্র।

গ্রন্থ সূত্র ঃ

১। পুঁজি ১ম খণ্ড, মার্কস।
২। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, স্তালিন।
৩। নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্র, ২য় পরিচ্ছেদে স্তালিন।
৪। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
৫। ঐ
৬। পুঁজি
৭। মার্কস, দর্শনের দারিদ্র।
৮। রাষ্ট্র ও বিপ্লব, লেনিন।
৯। ঐ

ভারতের মধ্যকালীন সমাজ

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতাগুলির একটির উৎপত্তি ঘটে ভারতে। এখানেই গড়ে ওঠে অত্যন্ত উচ্চস্তরের উন্নত এক সংস্কৃতি যা এই দেশের পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে এবং সমগ্রভাবে গোটা প্রাচ্যের মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও দূর প্রাচ্যের বহু জাতির সংস্কৃতির অগ্রগতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কার ইত্যাদির ফলে এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে. মানব-সমাজের একেবারে আদিতম কাল থেকেই ভারতে জনবসতি বর্তমান ছিল।

একটা সময় ছিল যখন পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে এই ধারণা পোষণ করতেন যে ভারতে সভ্যতার উদয় হয়েছিল অনেক পরে। বস্তুত, কিছু কিছু পণ্ডিত এমন মতও পোষণ করতেন যে ভারতে সভ্যতার আমদানি করেছিল বাইরে থেকে আসা আর্য উপজাতিগুলি। তখন প্রায়ই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা এবং প্রাচীন প্রাচ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির পশ্চাৎপদতার কথা বলা হোত।

খৃঃ পূঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কালে বিচিত্র ঐতিহাসিক পরিবেশ প্রভাবে এই বিরাট দেশে এবং তার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকারের রাষ্ট্র গঠন হয়েছে। সিন্ধুনদ উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে দেখা যায় এই অঞ্চলে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ। সাধারণভাবে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্র, রাজতন্ত্র এই তিন প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা ছিল।

সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকে এক এক অঞ্চলে অনেকগুলি গোষ্ঠী বা উপজাতীয় দল একত্রিত হয়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাসপ্রথামূলক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। এইভাবে শ্রেণী'ভত্তিক সমাজ গঠনের ফল হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুদ্ধ বিগ্রহের নায়কগণ 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করে রাষ্ট্রের প্রধান শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের অভিজাত গোষ্ঠী ও পুরোহিত সম্প্রদায় রাজাকে কেন্দ্র করে সমাজের উপর আধিপত্য চালাত। প্রথমে

রাজারা গোষ্ঠী বা দলের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হত কিন্তু পরে রাজাদের বংশধররাই সিংহাসনে আরোহণ করে রাষ্ট্র নায়কদের পদ গ্রহণ করত! মন্দিরের পূজারীরাই 'ব্রাহ্মণ' নাম গ্রহণ করে পেশাদার পুরোহিত সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত হত। ধনী বা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই রাজা নির্বাচিত হত। দরিদ্র জনসাধারণ বা নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না, ফলে রাজা নির্বাচন করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না।

বৈদিক আর্যগণের ইতিহাসের প্রথম যুগে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ছিল উত্তরাধিকার ভিত্তিক রাজতন্ত্র কিন্তু রাজার ক্ষমতা সভা' বা সমিতি নামক গণতান্ত্রিক সংগঠন কর্তৃক সীমাবদ্ধ ছিল। বৈদিক যুগের সভ্যতার দ্বিতীয় যুগে দেখা যায় যে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই যুগেও রাজাকে অভিষেকের সময় যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হত, তার দ্বারা প্রমানিত হয় যে, রাজার ক্ষমতা একেবারে নিরঙ্কুশ ছিল না। রাজাকে প্রতিজ্ঞা করতে হত যে, তিনি কখনো প্রজাপীড়ক হবেন না এবং ব্রাহ্মণ কূল ও সভার মতামত মেনে চলবেন। বেদগ্রন্থগুলিতে সরাসরি উল্লেখ করা আছে যে, স্ত্রীলোকদের 'গণ'-এর সভায় যোগদানের অধিকার ছিল না। সব রকমের রাজনৈতিক অধিকার থেকেই তাঁরা বঞ্চিত ছিলেন। সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার স্যাপার ও শাসন সংক্রান্ত সকল প্রশ্নেরই মীমাংসা করতেন সমাজের পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত সদস্যরা বিদথ সভা ও সমিতির মতো সমাবেশে জমায়েত হয়ে।

গোড়ার দিকে এই 'গণ' বলতে বোঝাত ছোট-ছোট ক্ল্যান বা উপজাতি গোষ্ঠীকে। তবে পরে এই গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কাঠামো। আর্যরা ঐক্যবদ্ধ, সুসজ্জিত নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বাস করতেন, কাযকর্ম করতেন একসঙ্গে মিলেমিশে ও দেবতাদের কাছে বলিদানের প্রাণী উৎসর্গ করতেন মিলিতভাবে এবং পরিশ্রমলব্ধ ফল গোষ্ঠীর সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। আর্যদের এই 'গণগুলি' শাসন করতেন গণপাতরা।

এই সমস্ত আর্য উপজাতির লোক বাস করতেন 'গ্রামে' আর গ্রামগুলি গঠিত হত বড়-বড় পিতৃশাসিত পরিবার বা কুল নিয়ে। গোষ্ঠীর

বন্ধন তখনও পর্যন্ত অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুভূত হোত গোত্র-এর অভাব। গ্রামগুলিতে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল।

রাজার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভা এবং সমিতির ভূমিকার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকল। ক্রমে ক্রমে আবির্ভাব ঘটল রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থায়ী রাষ্ট্রীয় পদগুলির। জনসাধারণকে কর দেওয়া শুরু করতে হল। এর আগে দেবতার কাছে কিংবা উপজাতির প্রধানের কাছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত যে পূজোর উপচার অথবা উপহার দেয়া হত তাকে বলা হোত 'বলি'। এখন সেই 'বলি' হয়ে দাঁড়াল বাধ্যতামূলক রাজকর, বিশেষভাবে নিযুক্ত রাজকর্মচারীদের মারফত রাজাকে এই কর দেয়ার নিয়মকানুন কড়াকড়িভাবে প্রবর্তন করা হল।

মৌর্যোত্তরকালে এবং বিশেষ করে গুপ্তদের সময় থেকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকাশের কোনো কোনো দিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রের অভিমুখী করেছিল। মগধের সিংহাসন দখল করার উদ্দেশ্যে রাজা চন্দ্রগুপ্ত ভারতীয় ভূ-খণ্ডগুলি থেকে বিদেশী সেনাবাহিনীর অবসান ঘটালেন ঠিকই, কিন্তু সারা দেশ জুড়ে শুরু করলেন দাসপ্রথা। শুরু করলেন উৎপীড়ন আর অত্যাচার।

মগধ-রাষ্ট্রের অস্তিত্বকালে এবং বিশেষ করে মৌর্য রাজাদের অধীনে রাজার ক্ষমতা ক্রমশ দৃঢ় ও সংহত হয়ে ওঠে এবং উপজাতিক রীতি পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায় সম-পরিমাণে। মৌর্য-সম্রাটদের আমলে রাজশক্তি বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এ সময়ে রাজাকে গণ্য করা হোত রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র' ও 'রাজা' সমার্থক।

বংশ পরম্পরা-সূত্রে উত্তরাধিকারের নীতিকে মেনে চলা হোত অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে। রাজার মৃত্যুর আগেই তাঁর একটি ছেলেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হোত। সাধারণত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই হতেন এর দাবিদার। তবে কার্যক্ষেত্রে সিংহাসন দখলের জন্য ভাইদের মধ্যে চলতো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অনেক সময় ভাই ভাইকে খুন করেও সিংহাসনে বসতেন। রাজাই ছিলেন সেই সময় রাজচক্রবর্তী।

সেই একচ্ছত্র রাজা যার ক্ষমতা প্রসারিত পশ্চিম থেকে পূর্ব সমুদ্র, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে। রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্বে থাকতেন এবং আইন প্রণয়নের অধিকারী ছিলেন রাজা নিজেই।

রাজা স্বয়ং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীকে নিযুক্ত করতেন। রাজস্ব-সংগ্রহ সম্বন্ধীয় বিভাগের প্রধান থাকতেন রাজা। অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী রাজার দেহরক্ষী-বাহিনী নিযুক্ত করার ব্যাপারে তখন বিশেষ নজর দেয়া হতো, কারণ রাজার বিরুদ্ধে নানা ধরণের ষড়যন্ত্র ছিল রাজসভাব প্রায় নৈমিত্তিক এক ঘটনা।

মৌর্য-রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত রাজার প্রধান পুরোহিতের। প্রভাবশালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকেই এই পুরোহিত নিযুক্ত হতেন। মৌর্য-রাজাদের আমলেই সংগঠিত ভাবে 'পরিষদ' স্বীকৃতি পায়। রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এই পরিষদ। এই পরিষদের কাজ ছিল গোটা শাসন-ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং রাজার নির্দেশ কার্যকর করা। পরিষদ ছাড়াও বিশেষ-ভাবে রাজার বিশ্বাসভাজন এমন স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি ছোট্ট গোপন পরিষদও থাকত।

রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরিষদের সদস্য হতেন শুধু যোদ্ধা ও যাজক সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত অভিজাত ব্যক্তিরাই। তাঁরা যথাসাধ্য নিজেদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকার রক্ষা করে চলতেন এবং সীমাবদ্ধ করে রাখতেন রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা। কিন্তু বৈদিক যুগে সমাজের আরও ব্যাপকতর সম্প্রদায়ের লোকজন পরিষদের সদস্য হতে পারতেন এবং ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে এটি ছিল তখন আরও বেশি গণতান্ত্রিক এক সংগঠন।

প্রাচীন সমাজে দাসগণসহ সকল সমাজের মানুষকে চারটে বর্ণে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এদের মধ্যে প্রথম দুটি প্রধান ভূমিকা পালন করত। শূদ্র বা দাসগণ ছিলেন সমাজের নিম্নবর্ণের। রাজা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই ছিল অধিকাংশ দাসের

মালিক। এছাড়াও বহু দাস ছিল সমগ্র রাষ্ট্র ও সমাজের সাধারণ সম্পত্তি। দাসদের বলা হতো 'দ্বিপদ-সম্পদ', আর গৃহপালিত পশুদের বলা হতো 'চতুষ্পদ সম্পদ'।

জমি যার দখলে থাকে অথবা যে জমি শাসন করে, জমিভোগের সেই হয় প্রকৃত অধিকারী, এই সামন্ততান্ত্রিক ধারণা গুপ্তযুগে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় ভারতীয় সমাজে বৃহদাকারের ভূসম্পত্তি প্রধানত রাজা মহারাজদেরই থাকত, আর থাকত গোষ্ঠীপতি ও সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের। রাষ্ট্র (রাজা) ছিল জমির সর্বোচ্চ মালিক। এই রাষ্ট্রীয় মালিকানার জন্যই দাস-মালিক ও অভিজাত গোষ্ঠীর পক্ষে দাসদের নিরঙ্কুশভাবে শোষণ করা এবং নানাভাবে কর বসিয়ে স্বাধীন কৃষকদের সর্বস্ব লুঠ করত। রাজস্বের প্রধান ধরণটি ছিল 'ভাগ' (অর্থাৎ রাজাকে দেয় অংশ)। কর হিসাবে রাজাকে কৃষির উৎপাদনসমূহের এক ষষ্ঠাংশ দিতে হত। কখনও এটা ছিল আরও বেশি। যে সমস্ত অঞ্চলে জমির উর্বরতা বেশি হোত ও বৃষ্টিপাত হোত প্রচুর, সেখান থেকে অবশ-এর চেয়ে আরও অনেক বেশি পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা হতো। এছাড়া রাষ্ট্রের আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলেও রাজার প্রাপ্য রাজস্বের এই অংশ আরও বাড়ানো হতো। কৃষিজীবী ছাড়াও নানা ধরণের কারুশিল্পী; বণিক ও গৃহপালিত পশু-প্রজনকদেরও রাজাকে কর দিতে হোত। বিশেষজ্ঞ এবং উচ্চতর বর্ণের প্রতিনিধি বলে রাজকর দেয়া থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণেরা। এছাড়াও রাজকর্মচারীগণ এই কর থেকে রেহাই পেতেন।

সামন্তবাদের বিকাশের ফলে শুধু যে সরকারই প্রজার কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের দাবিদার ছিলেন তাই নয়, প্রজাও আবার উপ-প্রজার নিকট থেকে উৎপন্ন ফসলের অংশ দাবি করত, এইভাবে ভাগীদারের এক পরম্পরার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যখন জমির পরিমাপ ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হতে থাকল তখন কৃষকদের স্বার্থ ও ক্ষুণ্ন হতে লাগল। কারণ জমি পরিমাপের এতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্ধারণের সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা

হিসাবে ধরাই হত না অথচ প্রকৃতির বিরূপতা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, বিশেষ করে সে যুগে। ফলে নতুন কর পদ্ধতিতে কৃষক অপেক্ষা রাজাই বেশি লাভবান হতেন, কারণ ফসল উৎপন্ন না হলেও রাজা বা সামন্ত নিজেদের ভাগ দাবি করতে পারতেন।

এইভাবে করের বোঝা স্বাধীন কৃষকদের উপর চাপিয়ে সর্বস্ব লুঠ করে 'রাজারা' ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে দাস প্রথার পরিবর্তে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটায় এবং কৃষক ও দাসগণকে ভূমিদাসে পরিণত করে। সামন্তপ্রভুগণ রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত এবং খাল ও জলাশয়, মন্দির ও দুর্গাদি নির্মাণ করতে ভূমিদাসদের বাধ্য করত। সাধারণভাবে কৃষকদের দুর্দশার কোন সীমা ছিল না। ভূমিদাস কৃষকদের অভাবনীয় দারিদ্রের মধ্যে পশুতুল্য জীবনযাপন করতে হত।

খ্রীষ্টীয় ২য়—৩য় শতাব্দী থেকে রোমে দাসভিত্তিক অর্থনীতির পতনের শুরু থেকেই বড় বড় কৃষিজমির মালিকেরা তাদের তালুক-সম্পত্তি ছোট ছোট ভাগে ভাগ করতে শুরু করে এবং সেগুলি চাষের জন্য ক্রীতদাস আর ভূমিহীন মুক্ত চাষীদের মধ্যে বিলি করে, যারা নিজেদের জমি হারিয়েছে। এই দুই গোষ্ঠীই ছিল খতবন্দী মজুরের বিপুল অংশ, যারা কাজ করতে এবং তাদের উৎপন্নের এক বড় অংশ জমির মালিককে দিতে বাধ্য ছিল। এইটে ছিল কোলোনাটাস ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্রের আদিরূপ উৎপাদনের নব ব্যবস্থা।

রাজা-মহারাজাগণ সকল সময়ে অমাত্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও সৈন্য-পরিবেষ্টিত হয়ে দুর্গতুল্য বিশাল প্রাসাদে বাস করত। এবং রাজা তাদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কারস্বরূপ বিপুল পরিমাণ জমি ও বহু সংখ্যক ভূমিদাস দান করে সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করত। ব্রাহ্মণগণরাই ছিল সামন্ততন্ত্রের প্রধান সমর্থক। তারা তাদের 'শাস্ত্র' দ্বারা সামন্ততন্ত্রকে সর্বতোভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করত বলে, রাজা-মহারাজ ও অভিজাতদের নিকট থেকে প্রচুর জমি ও বিপুল সংখ্যক ক্রীতদাস দান হিসাবে লাভ করত।

নতুন নতুন ভূমি ও ভূমিদাস সংগ্রহের জন্য রাজা মহারাজাগণ নিজেদের মধ্যে চালাত যুদ্ধ। পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। এই সকল যুদ্ধের ফলে বহু কৃষক তার জমির ফসল ও প্রাণ হারাত।

সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে কৃষি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজা মহারাজগণই ছিল প্রায় সমস্ত জমির মালিক, সামন্ত ভূস্বামী এবং পরনির্ভর, শোষিত কৃষক শ্রেণী, যাদের জমি ছিল না, যাদের কাজ করতে হতো সামন্ত প্রভুর জমির ছোট ছোট ক্ষেত্রে, যেখানে তারা বাঁধা পড়ে যেত আর যার ফসলের অংশ তাদের ছেড়ে দিতে হতো অর্থনীতি - বহির্ভূত বলপ্রয়োগের ফলে। সামন্তযুগে জমিই ছিল উৎপাদনের মূল উপাদান।

দেশের ভূ-সম্পত্তি তখন বিভক্ত ছিল তিনটি স্তরে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজার খাসদখল।

ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির মালিকদের মধ্যেও স্তরভেদ ছিল বিভিন্ন প্রকারের। ধনী ভূস্বামী ছাড়াও ছোট-ছোট টুকরো জমির দরিদ্র মালিকও ছিল অনেক। ধনী মালিকদের কিছু কিছু ভূসম্পত্তি এতই প্রকাণ্ড ছিল যে তারা চাষ করার জন্য কয়েক শো লাঙ্গলের দরকার হতো। এই ধরণের ভূসম্পত্তিতে চাষের কাজে চালানো হতো ক্রীতদাস এবং ক্ষেতমজুর দিয়ে।

বড় বড় ভূ-সম্পত্তির আয়তন যেখানে ছিল এক হাজার বিঘার মতন, সেখানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র টুকরো জমিও বড় কম ছিল না। ছোট জমির মালিকরা নিজ-নিজ পরিবারের সাহায্যে চাষ আবাদ করতেন। সম্পত্তির অধিকার অলঙ্ঘনীয় ও সুরক্ষিত ছিল। একমাত্র জমির মালিকেরই অধিকার আছে তার জমির সম্বন্ধে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার, প্রয়োজনবোধ করলে তিনি নিজের জমি বিক্রি করতে, দান করতে বন্ধক রাখতে কিংবা ইজারা দিতে পারেন এমন কি রাজারও অধিকার ছিল না ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিকে লঙ্ঘন করার। তবে রাজা ব্যক্তিগত মালিকানার জমির উপর কর ধার্য করতেন এবং স্বভাবতই

জমির অবস্থার ওপর সতর্ক নজর রাখতেন। যদি সেই জমি চাষ না করে ফেলে রাখত তাহলে রাজা সেই মালিকের ওপর অর্থদণ্ড করতেন।

রাষ্ট্রের মতো গ্রামীন সমাজেও জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস পেত, বিশেষ করে সমাজ নজর রাখত তার, সদস্য নয় এমন সব লোকের কাছে জমি বিক্রির ব্যাপারে। জমি বিক্রির সময় বিক্রেতার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের অগ্র-ক্রিয়াধিকার দেয়া হোত। বিভিন্ন গ্রামের সীমানা ও বিশেষ জমির অবস্থান নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তখনও সর্বোপরি এই গ্রামীন সমাজগুলির মতামত বিবেচনার মধ্যে ধরা হোত। সমাজ তার সদস্যদের মধ্যে ভুস্বামীদের অধিকারও রক্ষা করে চলত। এছাড়া সমাজ স্বয়ং দায়ী থাকত যৌথ মালিকাধীন জমি জায়গার জন্য যেমন চারণভুমি, ঘরবাড়ি এবং যৌথ জমির ওপর দিয়ে প্রসারিত রাস্তা, ইত্যাদির জন্য।

দেশের মোট জমি-জায়গার একটা অংশ ছিল রাষ্ট্রীয় জমি ও রাজার নিজস্ব বা খাস-দখলভুক্ত জমি। রাস্ট্রীয় জমি বলতে বোঝাত জঙ্গলজোত, খনি ও পতিত জমি। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামে ছোট ছোট জমিতে রাজার মালিকানা রাখার অধিকার ছিল। ইচ্ছা করলে তিনি জমি দাস বিক্রি ও ইজারা দিতে পারতেন।

খাস দখলী আবাদগুলিতে জমি চাষের কাজ করতেন ক্রীতদাস ও খেতমজুররা এবং নানা স্তরের ভাড়াটিয়া কৃষক প্রজারা। প্রাকৃতিক সম্পদ গণ্য হোত রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে, খনির মালিকানার ওপর থাকত রাষ্ট্রের একাধিপত্য।

খ্রীষ্ট জন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতাব্দীগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। শাস্ত্রসমূহে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া হয় ভুস্বামীদের অধিকারসমূহ ও তার সংরক্ষণের ব্যাপারে। আগের মতোই রাষ্ট্রের তরফ থেকে তখনও চেষ্টা হতো ভু-সম্পত্তি ও ভূমিগত সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার, আর গ্রামীন সমাজগুলি চেষ্টা করত জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করতে।

তবু ব্যক্তির মালিকানাধীনে ক্রমশ জমির কেন্দ্রীভবনের ধারাটি অব্যাহত থেকে যায় আগাগোড়াই।

খ্রীস্ট জন্মের পরবর্তী গোড়ার দিককার শতকগুলিতে ব্যক্তি-বিশেষকে ভূমিদানের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল এবং সবচেয়ে যা গুরুপূর্ণ ব্যাপার তা হল এই ভূমিদানের প্রকৃতি ক্রমশ বদলে যেতে শুরু করেছিল। এর পূর্বে ভূমিদান কেবল প্রযোজ্য ছিল জমির ব্যবহারের ক্ষেত্রেই, জমিতে কর্ষণরত কৃষকদের ওপর তার ফলে কোন অধিকার জন্মাত না। তাছাড়া আগে অনেক ক্ষেত্রেই ভূমিদানের মেয়াদ ছিল সাময়িক, অর্থাৎ ভূমির গ্রহীতা যতদিন বিশেষ সরকারী কাজে লিপ্ত থাকতেন শুধুমাত্র ততদিনের জন্যেই কিন্তু আলোচ্য সময়ে তা ক্রমশ বেশি বেশি করে বংশানুক্রমিক হয়ে উঠতে শুরু করল। এর ফলে ব্যক্তিগত মালিকদের অধিকার ইত্যাদি পাকাপোক্ত ও কায়েম হয়ে উঠল এবং এই মালিকরা মোটামুটি স্বাধীন হয়ে উঠলেন কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে। ফলত গ্রামীণ সমাজের মুক্ত সদস্যরাও ক্রমশ ব্যক্তি-মালিকদের অধীন হয়ে পড়তে লাগলেন, কেননা ব্যক্তি-মালিকরা মনোযোগী হয়ে পড়তে লাগলেন জমির ওপর তাঁদের অধিকার সম্প্রসারণে এবং ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে লাগল।

দেশের শাসকরা তাঁদের প্রজাদের জমিতে মালিকানা স্বত্ব দিতেন শর্তসাপেক্ষভাবে, অর্থাৎ শেষোক্তদের মালিকানা থাকত জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে খোদ জমির ওপর নয়। এই রকম শর্তাধীন মালিকানার ভিত্তিতে যাঁরা জমি পেতেন তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে রাজকরের সঙ্গে খাজনাও আদায় করতেন, তবে সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের একটা দলও পোষণ করতে বাধ্য হতেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের এই সব সৈন্যদলই একত্রে রাজার সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত হোত। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের ওপর সাধারণ কৃষকেরা আইন-সংক্রান্ত বিচার ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভরশীল ছিলেন না। ভূস্বামীরা কেবলমাত্র রাজকর আদায়ের ব্যাপারে আইনগত বিচার ও শাস্তিদানের অধিকারী ছিল। সামাজিক পদমর্যাদাগত বৈষম্যের বদলে ছিল জাতিগত বৈষম্য।

একদিকে যত বেশি পরিমাণে জমি ক্রমশ খাজনার অধীনে আসতে লাগল তত, সেগুলি বিলি করা হতে লাগল ভূমিদাসদের মধ্যে আর এই সব দান করা জমির গ্রহীতারা কেন্দ্রীয় সরকার ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল প্রজাবৃন্দ উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ বেশি-বেশি অধিকার ভোগের সুযোগ-সুবিধা পেতে লাগলেন। অপরদিকে গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই গ্রাম-সংগঠনের কর্মচারীরা, বিশেষ করে মোড়লরা, প্রায় ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীদের ওপর অধিকার ক্ষমতা—প্রয়োগের অধিকারী হয়ে উঠলেন। নিজ-নিজ গ্রামের মধ্যে ভূমি-রাজস্বের বাঁটোয়ারার ব্যাপারে তাঁদের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। গ্রামীণ সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ও গ্রামের অধীন অনাবাদী জমি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এই গ্রামকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এবং নিজেদের প্রয়োজনে জমি দখল ও অন্যান্য গ্রামবাসীর বেগার খাটুনিকে ইচ্ছে মতো কাজে লাগানোর মধ্যে দিয়ে এই রকম কিছু-কিছু গ্রাম্য মোড়লও কার্যত ছোটখাট সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী হয়ে দাঁড়ালেন।

একদিকে রাজকরের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে বৃদ্ধি পেতে লাগল বাধ্যতামূলক শ্রমের নানা ধরন। এ সময়ে কৃষকদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল রাস্তাঘাট ও সেতুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি কাজের। গ্রামে পরিদর্শনরত রাজকর্মচারিদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর এবং নানা ধরণের নির্মাণকর্মে যোগ দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

সামন্ত প্রভুদের সম্পত্তির পাশাপাশি কৃষক এবং হস্তশিল্পী অর্থাৎ যে মানুষেরা দ্রব্য উৎপাদন করত, তাদেরও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে ছিল চাষের সরঞ্জাম, ভারবাহী উৎপাদনে সাহায্যকারী গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পশুর খাদ্য, বীজ, খামার-বাড়ি, বসত-বাড়ি, বাসনপত্র ইত্যাদি। তেমন শহুরে কারিগরদেরও নির্দিষ্ট উৎপাদনের উপাদান ছিল।

উৎপাদনের প্রধান উপাদান জমির ওপরে সামন্ত একাধিপত্য কৃষককে অর্থনৈতিকভাবে সামন্তপ্রভুর ওপর নির্ভরশীল করে রাখত।

সামন্ততন্ত্র অর্থনীতি-বহির্ভূত বলপ্রয়োগও করত, যা ছাড়া সামন্ত উৎপাদন অসম্ভব ছিল। লেনিন বলেছেন: জমিদারের যদি ব্যক্তি হিসাবে কৃষকের ওপর প্রত্যক্ষ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যার জমি আছে এবং নিজে চাষ করে এমন একজন মানুষকে দিয়ে তার কাজ করাতে বাধ্য করতে পারত না। তাই এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন; 'অর্থনৈতিক চাপ ছাড়া অন্য 'কিছু' প্রয়োজন ছিল'....এই সংঘর্ষের আকার-প্রকার সামাজিক ভূসম্পত্তিতে কৃষকের অধিকারহীনতা থেকে ভূমিদাসত্ব পর্যন্ত নানা রকম হতে পারে। কৃষকরা জমিতে বাঁধা ছিল এবং সামন্তপ্রভুদের প্রায়শই অধিকার ছিল তাদের বিক্রী করে দেওয়ার।

মৌর্যযুগে ক্রীতদাস ভাড়াটে শ্রমিকদের কাছ থেকেই বেগার আদায় করা হত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দ থেকে সকল শ্রেণীর প্রজাদের কাছ থেকেই বেগার আদায় করা হত। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে প্রথম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রদত্ত অনুদান বিষ্টির প্রচলনের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ও বিহারে কৃষকগণ সর্বপ্রকার অত্যাচারের শিকার হত এবং পালদের দ্বারা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদত্ত গ্রামগুলিই একমাত্র এই সর্বপীড়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেত। শাসকসর্দারগণ সময় সময় বেগার আদায় করতেন, কিন্তু এই অধিকার দানগ্রহীতার হাতে চলে গেলে তা নিশ্চিতরূপে আরো ভয়ানক হয়ে উঠত, কারণ দানগ্রহীতা গ্রামের আয়ের উৎসগুলি পরিপূর্ণভাবে শোষণ করার জন্য বেগার প্রথার পূর্ণ সুযোগ নিত।

গ্রামবাসীদের সার্বজনীন সামাজিক অধিকার হরণ করে তা দানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করার ফলেই কৃষকগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বহুক্ষেত্রে অনুদত্ত গ্রামের সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হত না, দানগ্রহীতা সেই সুযোগে নিজ ভূসম্পত্তি বাড়িয়ে নিত। তাছাড়া পতিত জমি ঝাড়জঙ্গল, গোচরণভূমি, গাছগাছালি, জলাশয় ইত্যাদি দানগ্রহীতাকে হস্তান্তরিত করা হলে, দানগ্রহীতা ঐগুলি ব্যবহারের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করত। ফলে গ্রামবাসীদের গ্রামত্যাগ

ছিল চিরাচরিত। ভোগপতির অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত কৃষকেরা এমন বহু বর্ণনা রয়েছে। সম্ভবতঃ শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকগণ কর্তৃক গ্রাম পরিত্যাগই ছিল একমাত্র প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মধ্যযুগের প্রারম্ভকালে স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থায় কৃষকগণ জমির সঙ্গে আবদ্ধ থাকায় গ্রাম পরিত্যাগও সকল ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না।

দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত স্বনির্ভর আর্থিক এককের উপরই সামন্তীয় ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল। মুদ্রার অব্যবহার, পরিমাপের ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিমাপ ব্যবস্থার প্রচলন, রাজা ও সামন্তগণ কর্তৃক শিল্প ব্যবসায়ের নগদ ও বস্তুগত আয় মন্দিরকে হস্তান্তর, এই সমস্ত বিষয়গুলি আর্থিক এককের সাক্ষ্য বহন করে।

সামন্ততন্ত্রে গ্রামাঞ্চল ও শহরের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠছিল তার এক স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে রাজনৈতিকভাবে গ্রামাঞ্চল শহরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত, কেননা রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত জমিদারেরা, আর অন্যদিকে শহর গ্রামগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করত।

সামন্ত জমিদারের অর্থনীতি ক্রমশ বাণিজ্যে প্রবেশ করছিল এবং অর্থের ক্ষমতার অধীন হয়ে পড়েছিল। বেগার এবং জিনিসে দেওয়া খাজনা যেখানে সীমিত ছিল জমিদার ও তার পোষ্যদের প্রয়োজন মেটাতে, সেখানে আর্থিক খাজনা কৃষকের কাজ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা তখন সর্বদাই অর্থের প্রয়োজন বোধ করত। তাদের শোষণ আরও বেড়ে গিয়েছিল বণিকদের দ্বারা অসম বিনিময়ের মাধ্যমে, আর মহাজনদের দাসত্বমূলক ঋণের ভারে। পণ্য-অর্থ সম্পর্কের বিকাশ কৃষকদের নানা সামাজিক গোষ্ঠীতে পৃথক ও স্তরভিত্তিক করা ত্বরান্বিত করেছিল।

সামন্তযুগের প্রারম্ভে ভারতীয় সামন্তবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ ভূমি অনুদানের ফলে মধ্যভারত, উড়িষ্যা, ও পূর্ববঙ্গে বহু পতিত জমি আবাদযোগ্য হয়েছিল। উদ্যম ও সাহসী ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করে অনুন্নত ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে চাষবাসের নূতন প্রক্রিয়া প্রচলন করা সম্ভব হয়েছিল। পুরোহিতগণ কর্তৃক সমর্থিত কিছু মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি উপজাতীয়

অধিবাসীদের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ গোহত্যাকে নরহত্যার তুল্য জঘন্য অপরাধরূপে বিধান দেওয়ায়, গোধন-রক্ষায় সুফল পাওয়া গিয়েছিল। চাষ-আবাদের জন্য গোরু যে কত উপকারী তা সর্বজনবিদিত। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ আদিবাসীদের হাল ব্যবহার ও সার ব্যবহার শিখিয়েছিলেন তাছাড়া নক্ষত্র ঋতু ও বর্ষার আগমণ সম্বন্ধনীয় ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে কৃষির উন্নতি হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ভূমি অনুদানের ফলে অনুদত্ত ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হত। তৃতীয়তঃ ভূমি অনুদানের ফলে উপজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। এই সংস্কৃতি তাদের লিপি, শিল্প, সাহিত্য এবং উন্নত জীবনযাত্রার সন্ধান দিয়েছিল। অন্যদিকে গোটা সমাজের মধ্যে ছিল চরম শোষণ আর শাসন। সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করার কোন ক্ষমতাই ছিল না, যদিও অঞ্চলভিত্তিক কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল বহু স্থানে।

একদিকে সামন্তযুগে চলছিল রাজায়-রাজায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কোলাহল, অন্যদিকে কৃষক সমাজের সঙ্গে বড় বড় সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে চলছিল এক চরম অবস্থার ঠাণ্ডা লড়াই। ফলে ভারতবর্ষ সহজেই বৈদেশিক আক্রমণের শিকারে পরিণত হল। শুধু সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং লুণ্ঠন ও নরহত্যা প্রভৃতি দ্বারা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ থেকে মণি-মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লুঠ করে তার রাজধানী গজনিতে নিয়ে যান। এবং সঙ্গে অসংখ্য মানুষকে নিয়ে গিয়ে দাসরূপে বিক্রি করে দেন। এইভাবে মুসলমান সামন্তশ্রেণী ভারতবর্ষে কয়েকবার আক্রমণ করে ক্রমশঃ উত্তর ভারত নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসেন। এবং পরে দিল্লী শহরকে রাজধানী করে সুলতানী হুকুমত কায়েম করেন গোটা ভারতবর্ষে।

এই মুসলমান বিজেতাগণ নিষ্ঠুর শোষণ-উৎপীড়নের দ্বারা ভারতের জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে ফেলতে থাকে। সুলতানের শাসনাধীন সকল জমিই ছিল তার নিজস্ব সম্পত্তি। সকল চাষের জমির উপরই কর

ধার্য করা হত, এবং কর আদায়ের জন্য সমগ্র গ্রাম সমাজকেই দায়ী করা হত। সুলতানগণ কখনই প্রাচীন গ্রাম সমাজ ভাঙ্গার চেষ্টা করেনি বরং তারা গ্রাম সমাজের সাহায্যে উচ্চহারে সকল কৃষকের কাছ থেকে কর আদায় করত, অর্থাৎ গ্রাম সমাজই ছিল তাদের শোষণের হাতিয়ার। সুলতানরা অভিজাত শ্রেণীদের নিযুক্ত করত। এক একটি সুবৃহৎ অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য এই শ্রেণী কর আদায়ের এক ভাগ রেখে দিত নিজস্ব সৈন্যদল গঠনের জন্য, আর বাকি সবই যেত সুলতানের কেন্দ্রীয় কোষাগারে। কর আদায় করা এই অভিজাত শ্রেণী কৃষকদের ওপর অত্যাচারের সীমা রাখত না। কৃষকদের দমন করার জন্য সৈন্য বাহিনীকে কাজে লাগাত। সুলতানদের নির্দেশ মতন যুদ্ধ বিগ্রহ চালাত এবং এদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর প্রভৃতি ভূসম্পত্তি দান করা হত। সুলতানী আমলের এই সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সুলতানের পতন হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষে সুলতান শাসনের অবসান ঘটতে না ঘটতেই মুঘল সামন্ত প্রভুদের প্রবেশ ঘটে। শেরশাহ থেকে শুরু করে আকবর পর্যন্ত সকলেই নিপুনতার সঙ্গে ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জের টেনে গেছেন। ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পর আকবরই একমাত্র প্রথম নরপতি যিনি গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সামন্ত প্রভুর গুলবাগিচা বানাতে চেয়েছিলেন। এবং তাতে তিনি কৃতকার্যও হয়েছিলেন।

সারা দেশ জুড়ে রাস্তা ঘাট বানিয়ে, পথিকদের জন্য সরাইখানার বন্দোবস্ত করে, ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করে, গোটা দেশকে ছোট ছোট সাম্রাজ্যে ভাগ করে জনহিতকর কার্য চালিয়ে সারা দেশবাসীর মন জয় করেছিলেন ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে শোষণের তীব্রতা ছিল। সামন্ত কেন্দ্রীয় মনোভাব প্রকাশ পেতে লাগল। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন সুবায় একই মুদ্রা, একই ওজন, একই সরকারী ভাষা এবং শাসন বিষয়ে একই বিধি দূরত্বকে অতিক্রম করে ঠিকই কিন্তু সাম্রাজ্য শাসনকে কেন্দ্রীভূত করাই ছিল সামন্ততন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য সেই সময়।

এদেশে যখন মুঘল শাসন চলছে, তখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রাজতন্ত্রের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সেই সময় প্রচার করা হত, রাজত্ব হল ঈশ্বরের দান। ঈশ্বর ভিন্ন আর কারও কাছে তাই রাজাকে জবাবদিহি করতে হয় না। মুঘল শাসনকালে সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রের প্রতীক ও পরিচালক। তাঁর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত, অপরের পরামর্শ নিলেও সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র বাধ্যবাধকতা ছিল না। তিনি ছিলেন সমর বাহিনীর অধিনায়ক, আইন-প্রণয়নের এবং বিচার ব্যবস্থায় তিনিই ছিলেন মুখ্য ব্যক্তি, সমস্ত অধিকার রাজার অনুমতিসাপেক্ষ ছিল।

সম্রাটের চতুর্দিকে সাধারণত যারা থাকতেন তারা হলেন মুসলমান অভিজাত শ্রেণী, খুব কমই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণী। সাধারণ লোকের কোন বিশেষ স্থান ছিল না।

দেশে নানান সুলতান ও মুঘল সম্রাট আমলেও গ্রামাঞ্চলের চিরাচরিত ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। গ্রামের ছোট সামন্তপ্রভু, মোড়ল এবং গোটা কয়েক চৌকিদারই শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত।

শাসন ব্যবস্থা ছিল মুসলমান ধর্মকে কেন্দ্র করে। মুঘল শাসন-কালে কাজী ছিল বিচার বিভাগের মুখ্য ব্যক্তি, 'মুফ্‌তি' প্রভৃতি ছিল তার নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারী। গ্রামাঞ্চলে শাসন চলত 'সালিশ' কিংবা পঞ্চায়েত কিংবা কোন বিশেষ জাতিভুক্ত সমাজপতির দ্বারা। 'কাজীর বিচার' গ্রামাঞ্চলে ছিল না।

রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল অনেক সংগঠিত। প্রত্যেক পরগনায় থাকত একজন 'আমীর,' একজন তগবদ্ বিশ্বাসী 'শিকদার,' একজন 'খাজাঞ্চী' একজন হিন্দীতে এবং অপরজন ফারসীতে লেখার ভারপ্রাপ্ত 'কারকুন'। শেরশাহ তার বিভিন্ন অঞ্চল শাসক-কে আদেশ দিয়েছিলেন যে প্রতি বৎসর ফসল তোলার সময় জমি মাপতে হবে, জমির পরিমাণ এবং উৎপন্ন শস্যের অনুপাত অনুযায়ী খাজনা সংগ্রহ করতে হবে।

সেই জমিকে চার ভাগে ভাগ করা হত ; (১) যে জমি বৎসরের কিয়দংশ অকর্ষিত অবস্থায় থাকে ; (২) যে জমিতে সারা বৎসর চাষ

হয় ; (৩) যে জমিতে তিন চার বৎসর ধরে চাষ হয়নি এবং (৪) যে জমি পাঁচ বৎসর কিংবা তারও বেশী সময় পোড়ো অবস্থায় রয়েছে। যে জমিতে চাষ হয়েছে তারই ওপর বেশী খাজনা ধরা হত। শস্য দিয়ে কিংবা নগদ টাকায় চাষীরা খাজনা দিত আর শস্যের দাম অনুযায়ী নগদ টাকা কত লাগবে তা নির্ধারিত হত। খাজনার হার শস্যের অর্ধেক ধরা হত।

জমিকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা হত। 'খালসা' ছিল বাদশাহের খাস জমি ; তারপর হল 'জায়গির' বা জায়গিরদার আর মনসবদারদের কর্তৃত্বে থাকত ; আর তৃতীয় হল 'সয়ুরঘল', অর্থাৎ যে জমি বিদ্বান আর ধার্মিকদের দেওয়া হয়েছিল।

মুঘল শাসনকালে বাবর ভূমিরাজস্ব থেকে আয় করেছিলেন ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ; আকবর যখন বাদশাহ তখন রাজস্ব বেড়ে হল ১৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। পরে বেড়ে গিয়ে হয়েছিল ১৭ কোটি টাকা। জাহাঙ্গীর আমলেও ১৭ কোটি টাকা ছিল ; শাহজহানের আমলে বেড়ে গিয়ে ২১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। এই সময় যুদ্ধবিগ্রহে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রচুর টাকা ব্যয় হয়েছিল। এই সময় একদিকে যেমন ছিল উচ্চ অভিজাত শ্রেণী অন্যদিকে নিম্ন দীন মানুষ। দেশের সুবিপুল সংখ্যক মানুষ ছিল নিতান্ত নিস্ব শ্রমজীবী। বিলাসিতা, ফুর্তি, ধুমপান ও মদ্যপানের রেওয়াজ ছিল সেই সময় নিত্য নতুন ব্যাপার, বিলাসিতা ভিন্ন অন্য অনেক আপত্তিকর বৈশিষ্ট্যও নজরে পড়ে। আকবরের 'হারেমএ' পাঁচ হাজার মেয়ে ছিল।

আর যারা গরীব তাদের জীবন প্রদীপের নীচে পড়ে থাকা অন্ধকারের মতন ছিল। এক ওলন্দাজ সওদাগরের ভাষায় ; "তারা থাকে খড়ে ছাওয়া মাটির কুটিরে ; তাদের ঘরে আসবাব বলতে কিছু নেই, বড় জোর আছে কিছু বিছানা আর মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, গ্রীষ্মকালে ঐ বিছানায় চলে যায়, কিন্তু শীতকাল রাত্রি-যাপন যন্ত্রণার ব্যাপার। ঘুঁটে জ্বেলে তাঁরা হাত-পা সেঁকে নেয়"। বাংলাদেশ সম্বন্ধে আর এক বিদেশী লেখেন ; নরোম ভাতেই সঙ্গে একটু নুন পেলেই এরা তুষ্ট ;

এক রকম শাকও এরা খায়। যাদের অবস্থা ওরই মধ্যে ভালো, তারা দুধ, ঘি, ছানা ইত্যাদি খেয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন; যে তারা মেহনত করে সংসার চালাত, যারা দোকানে বা বাড়িতে কাজ করত, তারা ছিল কেনা গোলামের সামিল। এই ছিল প্রাচীন থেকে মধ্যযুগের দাস ও সামন্ততান্ত্রিই সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে সাধারণ গরীব শ্রমজীবি মানুষকে পণ্যের মতন ক্রয়-বিক্রয় করা হত। শাসন করা চলত, উৎপীড়ন আর অত্যাচার ছিল নিত্য দৈনন্দিন ব্যাপার। ভারতবর্ষের মানুষ ছিল কৃষিজীবি। সেই কৃষক সমাজের ওপর চলত নির্মম অত্যাচার অন্যদিকে গড়ে উঠল রাজ-বাদশাদের ইমারত, দুর্গ আর বিলাসের জন্য ঐশ্বর্যাপূর্ণ প্রাসাদ। স্মৃতির উদ্দেশ্যে গড়ে তুলত মনুমেণ্ট আর তাজ-মহল। ঠিক পাশেই সহাবস্থান করত গরীবের খড়ের চালা আর অর্দ্ধাহারে বসবাস। একদিকে ছিল করের বোঝা, অন্যদিকে ছিল সংস্কৃতির অবক্ষয়। রাজ প্রভুদের আর বাদশাহ হুকুমৎ মানুষকে করে তুলেছিল অসহ্য বিদ্রোহী। জায়গিরদার আর মহাজনের অত্যাচারের শেষ ছিল না। মাঝে-মধ্যেই দুর্ভিক্ষের কবলে সেই সময় মানুষকে পড়তে হত।

গ্রাম সমাজে সংগঠিত কৃষক ও কারিগরগণই তাদের পরিশ্রম ও নৈপুন্যে প্রাচীন থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তা আত্মসাৎ করত রাজা-মহারাজ আর বাদশাগণ।

কৃষকরা গ্রামে খাল ও জল সেচের ব্যবস্থা নির্মান এবং শুষ্ক জমিতে ধান, গম, ইক্ষু ও মসলার উৎপাদন করত। তারা উপযুক্ত জল সেচযুক্ত জমিতে বৎসরে দুই বা তিনবার ফসল ফলাত, শ্রমিকগণ খনি থেকেও সোনা হীরে সংগ্রহ করত, কারিগরগণ অতুলনীয় দ্রব্য-সম্ভার তৈরী করত। এমনকি ইউরোপের মানুষেরাও ভারতবর্ষ থেকে ধান তুলা প্রভৃতি চাষ করতে শিখেছিল। একালকার শ্রমিকরা তাদের নিপুনতার জন্য পৃথিবী খ্যাত হয়েছিল। নানান ধরণের কারুশিল্প অবাক করেছিল বহু মানুষকে। কিন্তু এই সকল সৃষ্টির ভোগ-দখল ছিল সামন্ত প্রভুদের। সামন্তদের বিলাসিতার জন্য ভোগ্য পন্য তৈরী

করে নিজেরা অনাহারে থাকত। প্রভুদের বড় বড় ইমারত নৈপুণ্যের সঙ্গে তৈরী করে নিজেদের কুটিরে শীতে সারারাত কাঁপত। এই ছিল সেই যুগের সমাজ ব্যবস্থা।

মোঘল-সাম্রাজ্যে গ্রামীন সমাজগুলি ছিল জটিল ধরণের সব সংস্থা। যৌথ ভূস্বামী হিসেবে সমাজের নিয়ন্ত্রাধিকার ছিল সাধারণত একেকটি গ্রামের চতুপার্শ্বস্থ ছোট এক ভূখণ্ডের ওপর এবং সমাজের প্রধান বা মোড়লের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত ওই ভূখণ্ডের অন্তর্গত আবাদী জমির প্রতিটি টুকরোর ওপর খাজনা ধার্য করার ও তা আদায় করার।

গ্রামীন সমাজের মোড়ল ও পুঁথি লেখক যেমন একদিকে ছিলেন সমাজের দুই প্রধান প্রতিনিধি তেমনই অপরদিকে তাঁরা ছিলেন রাজ-কর্মচারিও। মোড়ল তার পরিচালনাধীন গ্রাম থেকে দেয় পুরো অংশ আদায় করে দিতে পারলে তাঁর সমাজের সত্বাধীন সকল আবাদী জমির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জমি নিজস্ব হিসেবে পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। এই জমি হোত নিষ্কর। খাজনা দ্রব্যের পরিবর্তে অর্থমূল্যে দিতে বাধ্য করলে কৃষকেরা স্থানীয় মোড়ল ও মহাজনের জাঁতাকলে আরও বেশি বেশি করে পড়তে লাগল।

জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, বড় বড় স্বামী সামন্ত শ্রেণী জায়গিরদার, জমিদার, রাজকর্মচারী, মহাজন, ও মোড়ল প্রভৃতি মিলে ভারতবর্ষের সকল ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটায়। এই অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে একদিকে যেমন ভারতবর্ষ উন্নতময় হয়ে উঠেছিল ব্যবসা, বাণিজ্যে, শিল্পে, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতির বিকাশ, শিল্প সৃষ্টির নিপুনতা। এবং ধীরে ধীরে কৃষক অভ্যুত্থান ও অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে সামন্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজি ব্যবস্থার প্রবেশ ঘটে এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবেশ শুরু করে।

দাস-ভিত্তিক ব্যবস্থার চেয়ে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলি নতুন এবং উচ্চতর পর্যায়ে উৎপাদিকা শক্তির জন্ম দেয়; কৃষিতে শ্রমের লৌহ নির্মিত হাতিয়ারের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছিল। কৃষির সরঞ্জামের বিকাশ কৃষির প্রযুক্তির স্তর উন্নত করেছিল। শস্য-উৎপাদনের নতুন নতুন দিক খুলে গিয়েছিল, পশুপালনের গুরুত্ব বেড়েছিল। হস্তশিল্প উৎপাদনও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছিল। ধাতু গলানো এবং তার ব্যবহার উন্নত হওয়াটা ছিল শ্রমের যন্ত্রপাতি নিখুঁত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক গুরুত্বের ব্যাপার। জলচক্রে চালিত প্রথম তুবপুন জাতীয় যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছিল। খনিতে এবং কাঠ চেরাইতে জোরে চালানো জলচক্র শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। কাগজ এবং বারুদ তৈরিও শুরু হয়েছিল।

তাঁত ব্যবহার এবং পরে যান্ত্রিকভাবে তাঁত চালানো প্রচলিত হয় এবং এর ব্যাপকতা দেখা দেয়। ঘড়ি আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে সামন্তযুগের গুরুত্বপূর্ণ কারিগরী অগ্রগতির প্রমাণ মিললো। ছাপাখানা, নাবিকের কম্পাস ইত্যাদি আবিষ্কার আরও ভালভাবে প্রমাণ দিল অগ্রগতির।

উৎপাদনের কলাকৌশলের অগ্রগতি এবং শ্রমজীবী মানুষের কারিগরী দক্ষতার ক্রমোন্নত মান সামন্ত সমাজের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ কিন্তু উৎপাদনের বিকাশ ঘিরে রেখেছিল সামন্ত উৎপাদন সম্পর্কের সংকীর্ণ কাঠামো। এর কারণ ছিল বিরোধ। একদিকে কৃষক আর সামন্ত জমিদার; শ্রমজীবী জনগণ এবং সামন্ততন্ত্রের মধ্যেই; আর অপরদিকে সামন্তপ্রভু আর সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে; গ্রাম শহরে; মানসিক আর কায়িক শ্রমের মধ্যে; সামন্ত অর্থনীতির কোন মতে টিকে থাকার চরিত্র আর প্রসারমান অগ্রগতির মধ্যে গড়ে ওঠা পণ্য অর্থনীতির মধ্যে।

সামন্ত জমিদারের অর্থনীতি ক্রমশ বাণিজ্যে প্রবেশ করছিল এবং অর্থের ক্ষমতার অধীন হয়ে পড়ছিল। পণ্য-অর্থ সম্পর্কের বিকাশ কৃষকদের নানা সামাজিক গোষ্ঠীর পৃথক ও স্তরবিভক্ত করা ত্বরান্বিত

করেছিল। একদিকে যেমন বেশির ভাগ কৃষকই দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়েছিল, হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়েছিল, এবং সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল, তেমনি গ্রাম্য ধনী চাষীরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যারা সামন্ত জমিদারদের কাছ থেকে তাদের স্বাধীন সত্তা কিনে নিতে পেরেছিল, আর সেই সুযোগে গরীব চাষীর শোষকে পরিণত হয়েছিল।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির উৎপত্তি ত্বরান্বিত হয়েছিল চরম বর্বর বলপ্রয়োগের মধ্যে দিয়ে। এই বলপ্রয়োগ করেছিল বুর্জোয়া হয়ে ওঠা জমিদারবৃন্দ আর রাষ্ট্রশক্তি। মার্কস বলেছেন, যে শক্তিই হলো নতুন সম্ভাবনাময় প্রতিটি পুরনো সমাজের ধাত্রী।

ভারতেব প্রাচীনকালেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের কিছু কিছু ধরণ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে বেশির ভাগ জমিই যেমন চাষ করতেন মুচলেকাবদ্ধ মজুররা, ক্রীতদাসেরা নন, অপরদিকে 'রাষ্ট্রের সেবা'র বিনিময়ে ভূমিদানও করা হত অন্যদের। ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ধরণের ভূমিদানের পাট্টা হিসাবে ব্যবহৃত ছোট ছোট তাম্রফলকের সংখ্যা লক্ষণীয় রকমে বৃদ্ধি পায়। ফলে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা ক্রমে প্রজাদের ন্যায়-অন্যায় বিচার করার অধিকার পেলেন এবং কৃষকরা ক্রমশঃ বেশি করে হয়ে পড়তে লাগলেন তাঁদের প্রভুদের ওপর নির্ভরশীল।

মৌর্যত্তরকাল এবং বিশেষ করে গুপ্তদের সময় থেকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকাশের কোন কোন দিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রে অভিমুখী করেছিল। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ব্রাহ্মণদের ভূমিদান প্রথা। এই প্রথা ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী এবং মহাকাব্যে ও পুরাণেও এই প্রথার উল্লেখ দেখা যায়। গুপ্তদের কালে বঙ্গদেশে ও মধ্য ভারতে প্রদত্ত ভূমিদানের ক্ষেত্রে দানগ্রহীতাকে ভূমি-রাজস্ব ভোগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দান বিক্রয় অথবা ভূমির স্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার তাদের দেওয়া হয়নি। দানলব্ধ জমি ভোগের পরিবর্তে সনদ অনুযায়ী পুরোহিতগণ দাতা এবং দাতার পূর্বপুরুষদের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানকর্মে বাধ্য ছিলেন। গুপ্তকালের কিছু শিলালিপিতে দেখা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থাকে গ্রামদান করা হত,

কিন্তু তা ধর্মীয় প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হত। ফলে ৫ম থেকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে ভূম্যধিকারী মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। রাজগণ ধর্ম ও শিক্ষার প্রয়োজনে অগ্রহার দান করতেন—এই দানই ভূম্যধিকারী মঠ-মন্দিরের উদ্ভব ও বিকাশের অন্যতম কারণ। যদিও অধিকাংশ দান ব্রাহ্মণের নামে দেওয়া হত, কিছু কিছু মন্দিরের নামেও দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ধর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার ব্যায়ভার নির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হত। পরবর্তীকালে এই মন্দিরগুলির সম্পদ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে তারা নিজেরাই এক একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দির থেকে মঠে পরিণত হয়েছিল সম্পত্তির ভারে। মঠ বা মন্দিরের জমিতেও চলত চাষীদের ওপর জুলুম। অস্থায়ী চাষিদের দিয়ে জমি চাষ করান হত। যে কৃষককে জমি ও বলদ দেওয়া হত এবং সাধারণতঃ উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ আদায় করা হত। তবে মঠ বা মন্দিরের জমি চাষ করলে কৃষককে রাজস্ব দিতে হত না। তবে সকলেই ছিল অর্ধ-ভূমিদাস বা অস্থায়ী প্রজা।

ভারতের অন্যান্য স্থানে বিশেষ করে মধ্যভারতে কৃষকদের বেগার খাটান হত। ভূমিদান প্রথা ভারতের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের পর গ্রাম দান করা হত ব্রাহ্মণদের এবং অনেক সময় রাজকর্মচারীদেরও, ফলে দানগ্রহীতা প্রজাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়, কর আদায় করতে পারত। কৃষকরা জমির মালিকের অধীন ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনবোধে জমি থেকে চাষীকে উৎখাত করতে পারতেন। জমির তুলনায় দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল খুবই কম, এছাড়া চাষ-আবাদ করা তাদের পেশা নয় ফলে ব্রাহ্মণদের দখলে বহু গ্রাম সামন্তবাদী ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল।

একদিকে গ্রাম প্রধানদের দ্বারা চলত বাধ্যতামূলক শ্রম ও কর আদায়, যারা রাজ প্রতিনিধিরূপেও কাজ করত। অন্যদিকে চলত মন্দির ও মঠের ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ফলে কৃষকদের অবস্থা দাসের মত হয়ে গেল, অন্যদিকে নতুন নতুন কর আরোপের ফলে স্বাধীন কৃষকদেরও অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকল।

রাজ-প্রতিনিধিরা যেহেতু ভ্রমণশীল এবং তাদের পদও বংশানুক্রমিক ছিল না, সেজন্য তারা যে বাধ্যতামূলক শ্রম ও কর আদায় করত কৃষকদের পক্ষে সেটা ততটা ভারস্বরূপ ছিল না; কিন্তু দান গ্রহীতা গ্রামের মালিক স্থানীয় ব্যক্তি এবং তাদের প্রভুত্বও বংশানুক্রমিক হওয়ায় তাদের শোষণ ও অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

জমির সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামের স্থাবর, অস্থাবর অর্থাৎ প্রজাদেরও সম্পত্তিরূপে দান করার রেওয়াজ ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে সমুদ্র সেন নামক একজন সামন্তরাজ প্রদত্ত অনুদানপত্র থেকে জানা যায় মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও অনুরূপ দেখা যেত। ফলে ভূমিদাস প্রথা চালু হয়।

মনে হয় ভূমির সঙ্গে সঙ্গে দাসরূপে চাষীদের হস্তান্তরিত ক'রে দেবার প্রথা প্রধানতঃ সেই সমস্ত ভূমিখণ্ডেই প্রযুক্ত হত, যা কোনো সংগঠিত গ্রামের অংশবিশেষ ছিল না এবং সেই ভূমি এমন চাষী দ্বারা আবাদ হত, যারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে না থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত। এইরূপ ক্ষেত্রে চাষীর আবাদী জমি তার বাসগৃহের চারপাশে থাকত। যখন এই জমি দান করা হত তখন সেই জমির বাসিন্দা চাষীকে সেখানেই রাখা হত, না হ'লে দান গ্রহীতার খুব অসুবিধা হত। এই চাষীদের কিছু ছিল কিষাণ যারা দাতার লাভের জন্যই জমি চাষ করত। এইজন্য মনে করা যেতে পারে যে দাস দুই প্রকারের ছিল, একপ্রকার, যারা জমি চাষ করত অন্য প্রকার যারা গ্রামবাসী প্রজারূপে সেবা করত।

ভূমির সঙ্গে চাষীদের হস্তান্তরিত করার প্রথা দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে সম্ভবতঃ মধ্যভারত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দীর একটি বাকাতক অনুদানপত্রে চারটি কর্ষক নিবেশ দান করার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অর্থ এই যে চারটি কুটিরে বসবাসকারী চাষীদের দান গ্রহীতাকে সমর্পণ করে দেওয়া হল।

ভারতের পটভূমিকায় ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত চাষীদের পূর্ণ ভূমিদাস রূপে এবং গ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও হস্তান্তরিত প্রজাদের অর্ধদাসরূপে গ্রহণ করা উচিত। দান গ্রহীতার খাস জমিতে প্রজাদের কাজ করতে

হত না, যদিও তৎকালীন অর্থনৈতিক সঙ্কটের যুগে তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতেও পারত না।

দাস প্রথা প্রথমতঃ উপান্ত অঞ্চলে, পরে ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের কেন্দ্রভূমিতে প্রসারিত হয়েছিল। এর ফলে গুপ্তযুগে সামন্ত প্রথার সুচনা আরও বিকশিত হতে থাকে।

অনুদানভোগী আর্থিক অধিকার সীমা লঙ্ঘন করেছে কিনা সেটা দেখাশোনার জন্য শাসক কোনো ব্যবস্থা করতেন না। কৃষকগণ সম্পূর্ণভাবে দান গ্রহীতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করত…তা দানগ্রহীতা ধর্মনিরপেক্ষ অথবা ধর্মীয় যে অনুদানভোগীই হোক না কেন। সম্ভবতঃ ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানভোগীর অধীনে কৃষকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল, কারণ এইরূপ অনুদানভোগীদের রাজাকেও কিছু কর দিতে হত। কিন্তু সব মিলিয়ে কৃষকদের অবস্থা স্বাধীন, শক্তিমান চাষী ভূস্বামীর মত ছিল না, বরং তারা দান গ্রহীতার অধীনস্থ কৃষিদাসে পরিণত হয়েছিল।

মৌর্যযুগে ক্রীতদাস ও ভাড়াটে শ্রমিকদের কাছ থেকেই বেগার আদায় করা হত। কিন্তু খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সকল শ্রেণীর প্রজাদের কাছ থেকেই বেগার আদায় করা হত।

অনুদান গ্রহীতাকে এই অধিকার দেওয়া হত যে অনুদত্ত ভূমি সে নিজে ভোগ করতে পারবে, অথবা অন্যকে ভোগ করতে দিতে পারবে, ভূমি নিজে চাষ আবাদ করতে পারবে অথবা অন্যকে দিয়ে চাষ-আবাদ করাতে পারবে। এই অধিকারের মধ্যে দিয়েই কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করার অধিকার অনুদান গ্রহীতার ছিল। ফলে কৃষকদের স্থায়ী অধিকার দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এবং জমিদার ইচ্ছা করলে তাদের উৎখাতও করতে পারত এবং পরিমাণস্বরূপ কৃষকগণ ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়ে যেত। এছাড়া গ্রামবাসীদের সার্বজনীন সামাজিক অধিকার হরণ করে তা দানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করার ফলেই কৃষকগণ আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল।

এই ব্যবস্থা গুপ্তকাল থেকে পাকাপাকি ব্যবস্থায় পরিণত হল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পাঁচ শতাব্দী ধরে কৃষক ও শিল্পীগণ

ভূম্যাধিকারী মন্দির, পুরোহিত সর্দার, সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে গিয়েছিল। এরূপ অবস্থা পূর্বে কখনও ছিল না।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সামন্ততন্ত্রের পথে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় এগিয়ে থাকলেও প্রক্রিয়াটির সারবস্তু এই রকম ছিল: সামন্ত ভূস্বামী জমির মালিক এবং পরনির্ভর, শোষিত কৃষক শ্রেণী, যাদের জমি ছিল না, যাদের কাজ করতে হতো সামন্তপ্রভুর জমির ছোট ছোট ক্ষেতে, যেখানে তারা বাঁধা পড়ে যেত আর যার ফসলের অংশ তাদের ছেড়ে দিতে হতো অর্থনীতি বহির্ভূত বলপ্রয়োগের ফলে।

ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের গোড়ার দিকে কৃষিতে দু'বার চাষের ব্যবস্থা ছিল, কোন কোন জায়গায় পতিত জমি চাষেরও ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। কালে কালে তিনবার চাষের ব্যবস্থা চলিত হল যখন লোহার হাল, লাঙল এবং অন্যান্য ধাতু নির্মিত চাষের সরঞ্জাম কৃষি প্রযুক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। বাতচক্র এবং পরে জলচক্র সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তা ছিল এর অন্যতম কারিগরী অবদান।

সামন্তযুগে বাগিচা, চারণভূমি, আঙুর চাষ এবং কৃষির অন্যান্য নানা শাখারও বিকাশ ঘটেছিল। অর্থনীতির কৃষি চরিত্র এবং সামন্ত প্রভুদের সামরিক প্রয়োজনের কারণে পশুপালন, বিশেষতঃ অশ্ব পালনের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হত।

চাষের সরঞ্জামের এবং ধাতু গলানো ও তা ব্যবহার করার পদ্ধতির উন্নতি হস্তশিল্পের পুনরুত্থানে সাহায্য করেছিল। দাসভিত্তিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার যুগে হস্তশিল্পের পতন ঘটে। হস্তশিল্পের বিকাশ সামাজিক শ্রম-বিভাজনকে গভীর করে এবং সামন্ত শহর গড়ে তোলে।

সামন্তযুগে শহরগুলি, শুধু হস্তশিল্পের নয়, বাণিজ্যকেন্দ্রও ছিল। বণিক এবং মহাজনেরা শহরের জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনীগোষ্ঠী ছিল। বণিকেরা বণিক সংঘে সংগঠিত ছিল।

ব্রিটিশকালে কৃষি ও কৃষি আইন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আলু, চা, এবং কফির মত নূতন কৃষিজ পন্যাদির আর্বিভাব না হওয়া পর্যন্ত উৎপন্ন ফসলের শ্রেণীবিভাগ মোটামুটিভাবে একই ধরণের ছিল। সম্ভবতঃ প্রায় ৬০০০ বছর পূর্বে ভারতে স্থায়ী চাষবাসের সূত্রপাত হয়। সুদীর্ঘকাল ধরে চাল এবং গম ভারতের প্রধান খাদ্য শস্য ছিল এবং সমপযোগী আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য ছিল যব এবং জোয়ার। বহু যুগ আগে থেকেই ভারতে নানা ধরণের ডাল, তৈলবীজ, তুলা, পাট, নীল মশলা এবং তামাক উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত ফসল চাষ করার জন্য অতি সাধারণ এবং আদিম যন্ত্রপাতি ব্যবহার হতো। হাল্কা কাঠের লাঙল, কাঠ এবং বাঁশ দিয়ে তৈরি ফসল মাড়াইয়ের লাঠি। এবং লোহার তৈরি যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল হাল্কা ধরণের কোদাল এবং কাস্তে। এছাড়া যেটা ব্যবহার হতো সেটা হল মানুষের শ্রম. ষাড় এবং বলদের শক্তি। এসকলেরই সাহায্যে হাল, সেচ, এবং পানীয় জলের জন্য কুয়ো থেকে জল নিকাশ ইত্যাদি করা হতো এটাই ছিল ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের একমাত্র হাতিয়ার সহযোগী হিসাবে যৎ সামান্য গ্রামীণ শিল্প ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে উৎপন্ন নীল, তুলা, পাট এবং তৈলবীজ রপ্তানীর আশা সর্বপ্রথম দেখতে পেয়েছিল ঠিক এমনই সময় ইংল্যাণ্ডে শিল্পোন্নতি ঘটতে থাকে। ফলে চাহিদাও বাড়তে থাকে। একদিকে যেমন উৎপাদিত কৃষিপন্যের চাহিদা বাড়তে থাকে অন্যদিকে তেমন নতুন কৃষিজাত পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার চাপও সৃষ্টি করতে থাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ফলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের বাংলায় পাট চাষের এবং দাক্ষিণাত্যে তুলা চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। মুনাফা এবং বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের কৃষিতে রপ্তানীমুখী উৎপাদনের চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। মানুষের চাহিদা এবং ভারতের কৃষির বা অর্থনীতির বিকাশ

না ঘটিয়ে কোম্পানী মনোযোগ সহকারে দ্রুত কৃষিপণ্যের রপ্তানী ঘটাতে থাকে। এই রপ্তানী আরও দ্রুত বিস্তার লাভ করে ১৮৫০ সালে দেশের আভ্যন্তরীণ অঞ্চল সমূহের রেলপথ এবং সামুদ্রিক পরিবহনের উন্নতি ঘটলে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীগুলিকে বাণিজ্য সংস্থা রূপে তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করে দিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ শুরু হয়ে যায়। যার অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদনকারীর ভারতীয় তুলার উপর বেশী পরিমাণ নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। ফলে তুলা চাষের এলাকা ভারতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের কৃষকের আয় বৃদ্ধি হল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কাঁচা পাট ভারতীয় রপ্তানী তালিকাভুক্ত হলে পাট চাষের এলাকাও বৃদ্ধি পায় সেই সাথে দেশের অভ্যন্তরে পাটকলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কাঁচা পাটের মূল্য বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে কমতে থাকলে ১৯৩৫ সালে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে পাট চাষের এলাকা সঙ্কোচনের এক পরিকল্পনা বাংলার সরকার গ্রহণ করে মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য। এই ব্যবস্থা ১৯৪০ সালে বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৮৬০ সালের দশকে চাল এবং গমের রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়। তার অর্থ এই নয় যে, ভারতবর্ষের জনগণ সমগ্র উৎপাদনের অধিকাংশ ভোগ করার পরই রপ্তানি করা হতো। সেই সময়ও অধিকাংশ মানুষই দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্যের ভোগ করতে পারত না। এছাড়া যে অংশ চাল এবং গম উৎপাদন হতো তা প্রয়োজন তুলনায় অনেক কম। মুনাফা'র জন্য উৎপাদন হওয়াতে মানুষেরা সেই সময়ও অনাহারে জীবন-যাপন করত। ১৮৮০ সালের কাছাকাছি প্রতি বৎসর প্রায় ১২ লক্ষ টন খাদ্য শস্য রপ্তানী হত। ১৯১৯-২০ সাল পর্যন্ত ভারতকে খাদ্যশস্য রপ্তানীকারী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হোত। এবং ১৯২১ সালের পর থেকেই ভারতবর্ষ খাদ্যশস্য 'আমদানীকারী' দেশ হিসাবে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতে খাদ্য আমদানী কমে গেলে এবং ভারতকে সিংহলে চাল রপ্তানী করতে হলে বাংলার খাদ্যের মূল্য অত্যাধিক বেড়ে যায়। ফলে প্রায় ১৫ লক্ষ লোককে দুর্ভিক্ষের শিকার হতে হয়। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে খাদ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকলে আরো বেশী পরিমাণ খাদ্য আমদানী করতে হয়। কেবল ১৯৪৫-৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ বৎসরে ২৫ ৩০ লক্ষ টন পর্যন্ত ছিল। যে হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছিল সেই হারে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে নি। ফলে মূল্যবৃদ্ধি এবং আমদানী রোধ করাও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। একই সাথে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রকৃত পক্ষে ক্রমে ক্রমে কমে এসেছিল। যেহেতু রপ্তান মুখী কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রবণতা সেই সময়কার শাসক গোষ্ঠীর ছিল এবং চাষীদের হাতে পয়সা বা উৎপাদিত ফসল বিক্রী করার কোন সমস্যা ছিল না সেহেতু সকলেরই প্রবণতা ছিল ভোগ্যপণ্য কৃষিজাত ফসল উৎপাদন না করার। বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যই চাষীদের উৎসাহ বাড়িয়ে ছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই ধরনের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ফলে দেশের কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থায় বৈচিত্র-সাধন আসলে চা, নীল এবং আফিমের চাষের পিছনে বিশেষ এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছিল। কৃষি উন্নতির কোন সাধারণ নীতি কোম্পানীর না থাকায় একমুখী উৎপাদন ব্যাপক জনগণের সমর্থন পাইনি ফলে কৃষক সমাজে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল কোম্পানীর বিরুদ্ধে।

ইংল্যাণ্ডের তুলাজাত শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারীর ভারতীয় কাঁচা তুলোর গুনগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য ভারত সরকারকে চাপ দিতে থাকলে ১৮৬৯ সালে ভারত সরকার সাধারণ নীতি হিসাবে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে কৃষি বিভাগ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেই সময় শিক্ষিত কৃষি বিশেষজ্ঞের অভাবে সকল কৃষি বিভাগগুলি প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে পরে আমেরিকার অর্থ সাহায্যে ভারত সরকার নানান জায়গায় কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৯০৬ সালে

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় কৃষি কৃত্যক গঠন করা হয়। ১৯০৫ সালে থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে সেচ কার্যের উন্নতির গতিকে তরান্বিত করেছিল।

১৯১৯ সালের সংবিধান সংস্কার অনুসারে কৃষি সমবায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভার প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়। কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে গবেষক কর্মীর শিক্ষাদান বাবদ খরচ ছাড়া কেন্দ্রের পক্ষে আর কোন অর্থ ব্যয সম্ভব হত না। ফলে প্রাদেশিক মন্ত্রীরা কৃষির উন্নতির জন্য তেমন কিছু করার সুযোগ পেত না। ১৯৩৫ সালের পর প্রদেশগুলির হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা এলে কৃষির উন্নতির জন্য কিছু করতে সক্ষম হয। কিন্তু এমনই সময় আবার বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে কৃষির উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে পুনরায।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরে প্রদেশগুলিতে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সকল মন্ত্রিসভা ঋণ-সালিশী মহাজনী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, প্রজাস্বত্ব সংস্কার এবং গ্রামীণ নির্মাণকার্য সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল কিন্তু ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা হলে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করলে প্রাদেশিক প্রশাসনের কাজ আবার আমলাতন্ত্রের হাতে চলে যায়। এবং কৃষি উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা চলতে থাকে।

আধুনিক সমবায় আন্দোলনের পূর্বেও ভারতে কিছু দেশীয় আকারের সমবায় ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। পাঞ্জাব এবং অন্যান্য কতিপয় প্রদেশে কৃষকগণ প্রায়ই দলবদ্ধভাবে এক এক এলাকার জমি চাষ করত এবং নিজেদের শ্রমের পরিমাণ এবং গো শক্তি সরবরাহের ভিত্তিতে প্রতিবৎসর উৎপাদিত ফসল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। স্থানীয় সড়ক নির্মাণ এবং তার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সমবায় অথবা যৌথ প্রয়াস লক্ষ করা যেত। দক্ষিণ ভারতে নিধি নামে এক ধরনের সমবায় ভিত্তিক সঞ্চয় এবং অর্থ সরবরাহ সমিতি গড়ে উঠেছিল।

১৮৯৫ সালে তৎকালীন দেশীয় নৃপতি-শাসিত রাজ্য মহীশূর জমির মালিকদের জন্য একটি সমবায় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা শুরু করে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছু উৎসাহী সরকারী কর্মচারীদের সহয়তায় উত্তরপ্রদেশের কিছু সংখ্যক গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল। এবং একই সময় এক উকিলের নেতৃত্বে বাংলার ক্রেতা সমবায় সমিতির সূচনা হয়। এই সকল সমিতিগুলিই প্রচলিত কোম্পানী আইনের অধীনেই রেজিস্ট্রিভুক্ত হত। এই ধরনের বহু সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল গ্রামীণ কৃষক সমাজকে উন্নতর করে তোলার জন্য।

সমবায় কৃষিঋণ সমিতিগুলিকে গ্রামীণ জনগণের স্বল্পকালীন ঋণদান সমস্যার সমাধানের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু কৃষকদের দীর্ঘকালীন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছিল। যা মেটাতে কোন সমবায় কিংবা ভারত সরকার সক্ষম হয়নি। ফলে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জমি বন্ধক দিয়ে ঋণ নিতে হয়েছিল। ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া যার সূচনা করে। পরে এই ধরনের আরও ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং ঋণের বদলে জমি বন্ধক নেওয়া হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে ভারতে ১০৪ লক্ষেরও অধিক প্রাথমিক ঋণদান সমিতি এবং ২৮৩টির অধিক প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। এই পরিকল্পনার ফলে একদিকে যেমন জমিতে কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল অন্যদিকে বহু কৃষক ভূমিহীন শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে। ফলে কৃষকদের সংগ্রাম আরও বেশী করে দাঁনা বাধে। কৃষকরা তাদের সর্বস্ব খুইয়েছিল শুধুমাত্র এই ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমেই নয়। আরও অনেক ধরণের শোষণ ব্যবস্থা ছিল। যেমন মহাজনী শোষণ ব্যবস্থা।

প্রাচীন ভারতের গ্রামে চাষ-আবাদের সময় কৃষকের কৃষিসংক্রান্ত কাজে অর্থ সরবরাহ রাষ্ট্র কিংবা রাজস্ব আদায়কারীগণ (অধিকাংশ জমিদার) করত। অর্থাৎ ঋণ দিত। কৃষিতে যেহেতু বাণিজ্যিক ফসল উৎপন্ন হত সেহেতু ভোগ্য পণ্য ক্রয়ের জন্য কৃষককে মাঝে মাঝে ঋণের জন্য গ্রামের সাহুকার (বণিক এবং মহাজন) এবং জমিদারদের দারস্থ

হতে হত। সেই সময় জমি বন্ধক রাখার কোন মূল্য বা ব্যবস্থা ছিল না বলেই কৃষকের জমি বন্ধক না রেখে ক্ষমতানুযায়ী ঋণ দেওয়া হত ফলে এই ধরনের ঋণের সুদ কখনও আসল অপেক্ষা বেশী হত না। এই প্রথা সেই সময় 'দামতুপত' নীতি হিসাবে পরিচিত ছিল। জমির উপর স্বত্বাধিকারের ব্রিটিশ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা হবার সাথে সাথেই জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি পেল। ফলে মহাজনীরাও সেই সুযোগ নিয়ে জমি বন্ধক নিতে শুরু করল তার দেওয়া ঋণের বিনিময়ে। অন্যদিকে জমির উপর ক্রমবর্ধিত খাজনার বোঝা প্রতিবছর খরা এবং দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষকদের অবস্থা দিনের পর দিন শোচনীয় হয়ে আসতে থাকায় জমি বন্ধকের হার আরও বাড়তে থাকে। সুযোগ সন্ধানী এই সকল মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি সুদের পরিমাণ শোধ করতে না পারায় সাধারণ কৃষক রায়তগণ জমির মালিকানা হারিয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হতে থাকে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে। অন্যদিকে গ্রামের এবং শহরের বিত্তশালী জমিদার, মহাজন মালিক শ্রেণীর পরিবারের হাতে জমি চলে যেতে থাকল। সে কারণেই কৃষক বিদ্রোহগুলি আরও দুর্বার গতিতে শুরু হ'তে থাকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

ভারত সরকার এই বিদ্রোহে ভয় পেয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন মহাজনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ১৮৭৯ সালে দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবি ত্রান আইন বিধিবদ্ধ করা হয় কিন্তু তা বানচাল করে দেয় মহাজনদের বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন পদ্ধতি। শুরু করে দেয় আরও জঘন্ন অপরাধ। সুদের হার বাড়িয়ে, ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে, কৃষকের কাছ থেকে জমির উপ-ইজারা অধিগ্রহণ করে জমি বন্ধকী নিয়ন্ত্রাদি গুলিকে লঙ্ঘন করত।

এই সমস্ত ঘটনায় ভারত সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ১৮৯৫ সালে জমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলির মতামত নিয়ে ১৯০১ সালে পাঞ্জাব জমি হস্তান্তর আইন, ১৯০৩ সালে বুন্দেলখণ্ড জমি হস্তান্তর আইন এবং ১৯০৪ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জমি হস্তান্তর আইনগুলি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।

আরও পরে ১৯১৬ সালে মধ্যপ্রদেশে জমি হস্তান্তর আইনও গঠন করা হয়।

এই আইনগুলিতে জনগণের কতকগুলি শ্রেণীকে 'অকৃষিজীবি' শ্রেণী বলা হয়েছিল এবং যে সমস্ত অকৃষিজীবি শ্রেণীর হাতে জমি বন্ধক ছিল নির্দিষ্ট সময়ের পর মূল জমির মালিককে জমি ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে অনেক সময় মূল কৃষকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে যেত। এবং জমি যে আসলে তার ছিল এটা প্রমাণ করা খুবই দুঃস্কর ছিল তখনকার কৃষক সমাজের। একদিকে তারা ছিল নিরক্ষর এবং অন্যদিকে অজ্ঞ ফলে এই আইনগুলি কেবলমাত্র প্রহসনে পরিণত হয়েছিল যদিও ১৯১৩ সালে জমি বন্ধকীর দায়মোচন আইন দ্বারা জমি ফেরৎ সহজতর করার চেষ্টা হয়েছিল।

ভারত সরকার যতই আইন করুক না কেন সেই সময় মানুষ সংগঠিত ছিল না। যোগাযোগের অভাব, শিক্ষার অভাব এছাড়া প্রতি বছরই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লে পরে মানুষের শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। আর মহাজনীরা তাদের সুবিধা মতন আইনকে ফাঁকি দিয়ে বেড়াত। তারাও যে কৃষিজীবী শ্রেণীর মানুষ তা প্রমাণ দেবার জন্য জমিতে কৃষিকার্য শুরু করত এবং সেই সময় থেকেই কৃষিতে জমি হারিয়ে যাওয়া ভূমিহীন মজুর কৃষকের ভীড় বাড়াতে থাকে। চলতে থাকে ব্যাপক সামন্ত শোষণ।

১৭৯৩ সালে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভূস্বামী (জমিদার) এবং প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ রাখবার জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার নিজেদের হাতে রাখে। কিন্তু জমিদারদের অত্যাচার, অত্যাধিক খাজনা আদায়, বা জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সেই সময় ব্রিটিশ সরকার কোন আইন করতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকার নিজে এই বিবাট ভাবতবর্ষে খাজনা আদায় করতে পারবে না বলেই জমিদারদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত কার দেয়। জমিদাররা একদিকে যেমন কৃষকদের উপর খাজনার বোঝা চাপিয়ে দিত অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারকেও খাজনার অংশ সময় মত পৌঁছে দিত না. ফলে সরকারী মহলে বেশ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়।

অবশেষে ১৮৫৯ সালে খাজনা বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৮৫৯ সালের আইনে রায়তগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; ১) একটি নির্দিষ্ট খাজনার হারে ভূমিস্বত্ব ভোগকারী রায়ত; ২) ভোগ দখলকারী রায়ত; ৩) ভোগ দখল বিহীন রায়ত। জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করার দাবী তুললে পূর্ববর্তী ২০ বছর ধরে যে সমস্ত প্রজা অপরিবর্তির খাজনা প্রদান করবার শর্তে জমির মালিকানা ভোগ করত তারাই ছিল প্রথম শ্রেণীর। এদের খাজনা বৃদ্ধির হাত থেকে রক্ষার ভালই ব্যবস্থা ছিল। অন্যদিকে ১২ বছর ধরে যে সকল প্রজা একই জমির মালিকানা ভোগ করত তাদের ভোদখলকারী প্রজা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হত। এদের খাজনা কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণেই বৃদ্ধি করা যেত। যেমন, তাদের চাষের এলাকা এবং শস্য মূল্যের বৃদ্ধি পেলে কিংবা যেসব ক্ষেত্রে খাজনার হার পরগণা খাজনা হারের চেয়ে কম ছিল। সমস্ত ক্ষেত্রে খাজনার সমতা আনার জন্য খাজনা বৃদ্ধি করা হত। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ভোগদখলকারী রায়তগণের ক্ষেত্রে আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। এই আইনের একটি ধারায় ছিল যে কোন প্রজা একটি নির্দিষ্ট গ্রামে যে কোন এক খণ্ড জমি ১২ বছর চাষ করলে ভোগদখলের অধিকার পাবে। প্রকারন্তেই যা জমিদার- মহাজন শ্রেণীর স্বার্থই রক্ষা করত। কেবলমাত্র ১৫ বছর অন্তরই খাজনা বৃদ্ধি করা সম্ভব হত। খাজনা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি কার্যকরী হত।

'ভোগদখলের' অধিকার অর্জনের জন্য নানা প্রদেশে নানান রকম আইন ছিল। কিন্তু যেরকমই থাকুন না কেন 'ভোগদখলের' অধিকার কিছু পরিমাণে উৎকৃষ্টতর সুবিধা ভোগ করার পথ সুগম করে দিত। ভোগদখলকারি কৃষকদের উপরে ছিল জমিদার, অন্যান্য মধ্যস্বত্বের অধিকারী জমির মালিক এবং অপরিবর্তিত হারে খাজনা প্রদানের শর্তে ভূমিস্বত্ব ভোগকারী প্রজাবৃন্দ। এবং এদের নিম্নে ছিল উচ্ছেদযোগ্য প্রজা এবং বর্গাদারী প্রথার ভিত্তিতে চাষবাসকারী কৃষক।

১৯২৮ সালের আইনের বলে বাংলার জমি ভোগদখলের অধিকার

বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করার অধিকার প্রজারা পেল একটি শর্তে। শর্তটি হল জমি হস্তান্তরের সময় জমিদারকে কিছু অর্থ দিতে হবে। এবং একই সঙ্গে উচ্চতর জমিদারকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল ঐ জমি অগ্রক্রয়ের। এই আইনে ভোগদখলকারী প্রজারা সন্তুষ্ট ছিলেন না যদিও এদের অনেকেই জমিদার কিংবা ভুস্বামীতে পরিণত হয়েছিল। এই সমস্ত সুবিধা সাধারণ কৃষক বা উচ্ছেদযোগ্য প্রজারা ভোগ করতে পারত না।

১৯৩৭ সালে প্রদেশগুলিতে নতুন মন্ত্রিসভা ক্ষমতা পেয়ে ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন এক প্রজার কাছ থেকে অন্য প্রজার জমি হস্তান্তরের সময় জমিদারকে দেওয়া অর্থ প্রদানের নিয়ম বাতিল করে দিয়েছিল। ভোগদখলকারি কৃষকের কাছ থেকে জমি পুনরায় ক্রয় করার ক্ষমতাও বিলুপ্ত করা হয়েছিল। এবং খাজনার উপর সুদের হারকে নিয়মের মধ্যে আনা হয়েছিল। জমির বকেয়া খাজনা উদ্ধারের জন্য জমিদারদের রাতারাতি জমি নীলাম করার নাতিও নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছিল। এই ধরনের আইন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে চালু করা হয়েছিল। এই আইন কেবলমাত্র এক শ্রেণী প্রজারই স্বার্থ রক্ষা করেছিল কিন্তু প্রজাবর্গের বৃহৎ অংশের কোন স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। একদিকে যেমন কৃষকদের উপর ঋণের বোঝা বেড়ে চলেছিল অন্যদিকে তেমন কৃষির বিনাস ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। পুরাতন প্রথার সামন্ত কৃষি ব্যবস্থা ভারতের গ্রামাঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন চালু হওয়ায় কোন পরিবর্তন হয় নি। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় কিন্তু অধিকাংশই ছিল বাণিজ্যভিত্তিক। ভোগ্যপণ্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন ছিল খুবই কম। যদিও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ যানবাহনের বিকাশ ঘটেছিল যা মূলত ছিল বৃটিশ স্বার্থ। যে সকল আইন করা হয়েছিল কৃষক সমাজের জন্য তা ছিল প্রধানত এক শ্রেণী কৃষক, জমিদার, মহাজন এবং দখলকারি স্বার্থে। সমগ্র পিছিয়ে পড়া কৃষক সমাজের কোন পরিবর্তন হয় নি। সামন্ত ব্যবস্থার উৎখাৎও কোন আইন করতে

পারে নি। যা আজও এই বিংশ শতাব্দীতে বর্তমান।

ব্রিটিশের ভারত বিজয়ের ফলে শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনই নয় দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ও ব্যাপক রদবদল ঘটে। এদেশে স্থায়ী বসবাস ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে বসবাসের বদলে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে সম্পদাহরণ এবং তাদের মাতৃভূমিতে পাঠানোর উৎস হিসাবে দেখেছিল।

ব্রিটিশ শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শোষণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল। কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত ভূমিরাজস্ব ছিল ঔপনিবেশিক আয়ের প্রধান উৎস কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃক কৃষি উন্নয়নের সহায়ক একটি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসতি হয়েছিল। তাদের প্রবর্তিত বাংলায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', দক্ষিণ ভারতের 'রায়তওয়ারি' উত্তর ভারতের মৌজাওয়ার' এবং পাঞ্জাবের 'গ্রাম পঞ্চায়েত' সহ সকল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একই পরিণতি ঘটেছিল। সমস্ত কিছু খুইয়ে দিয়ে চাষীদের কোনরকম জীবিকা-নির্বাহের পর কৃষিকার্যে ব্যবহৃত সাজসরঞ্জাম ও কৃৎকৌশল উন্নয়নের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল রকম রাজস্ব ওঠা-নামা করত জমির ক্ষয়-ক্ষতি বা মূল্য বৃদ্ধির উপর। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে স্থায়ী খাজনা চালু হলে কৃষকদের অবস্থা দিনের পর দিন করুন হতে থাকলে বিদ্রোহের দানা আরও তীব্র হতে থাকে। মোগল শাসনকালে ভূস্বামীরা কৃষকদের অবস্থার কথা উপলব্ধী করত এবং প্রয়োজন মতন সাহায্যই করত। কৃষকদের জীইয়ে রাখার চেষ্টা করত কিন্তু ব্রিটিশ আমলারা বাঁধা-খাজনা নিয়ম-মাফিক না দিতে পারলে নানান ব্যবস্থা নিত। ফলে কৃষকদের অবস্থা ব্রিটিশকালে আরো অবনতির দিকে যায়। এই অবস্থার মূলে ছিল ব্রিটিশ তৈরী তিনটি পরীক্ষামূলক ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা। এই সবেরই মূলে ছিল বাংলার গভর্ণর-জেনারেল কর্ণওয়ালিস।

ভারতের ব্রিটিশ শাসন চালু হলে প্রথমেই তারা সামন্তদের উপর আক্রমণ করে। তাদের পরিবারের বিপুল সংখ্যক লোক লস্কর, চাকরবাকর উৎখাত করে। শত শত বছর ধরে কৃষকের উপর শোষণ চালিয়ে যে অর্থ উপার্জন করত তা সবই ব্যয় করত নাচ, গান ফুর্তি বিলাসিতা ইত্যাদির মাধ্যমে। কোন অংশই উৎপাদনে ব্যবহৃত করত না। কৃষির বিকাশ তো ঘটাতই না এমন কি কৃষক সমাজের সার্বিক উন্নয়নের বা সুখ-দুঃখের কথাও ভাবার সময় ছিল না সামন্ত প্রভুদের।

কৃষক শোষণের সামন্ততান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যবহার ও তা তীব্রতর করণের মাধ্যমে কোন পূর্ব পুঁজিলগ্নির ঝামেলা ছাড়াই ব্রিটিশরা ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহে সমর্থ হয়েছিল। সম্ভবত এই কারণেই ভারতে কোন বড় আবাদ গড়ে ওঠে নি (উনিশ শতকের মধ্যভাগে আসামের চা বাগানগুলি ছাড়া) আফিম ও নীল ক্রয়ে জবরদস্তিমূলক চুক্তির ব্যাপক প্রচলন ছিল। নিজ ক্ষেতে এসব ফসলের চাষীরা বস্তুত ভূমিদাসেই পরিণত হয়েছিল। নীলকররা কৃষকদের দাদন দিয়ে অসহায় করে ফেলেছিল এবং শেষে তারা পক্ষপাতী চুক্তির শর্তমোতাবেক অত্যল্প দামে এদের পুরো ফসল কিনে নিত। অর্থাৎ কৃষকরা কখনই আর ঋণ শোধে সমর্থ হত না। পৈত্রিক ঋণ সন্তান-সন্ততিদের উপর বর্তাত। প্রতিটি নীলকর বরকন্দাজ রাখত, এরা কৃষকদের পাহারা দিত এবং পলাতকদের নিজ খামারে ফিরিয়ে আনত বা পাশের খামারে ক্ষেত মজুরদের জোর করে নিজেদের খামারে খাটাত। এইসব বে-আইনী পদ্ধতি, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ ১৭৮০-র দশকগুলি থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বার বার নীল বিদ্রোহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

১৮২০-র দশকে ব্রিটিশ খামার মালিকরা বিহারের কৃষকদের অধিকতর আখ চাষে উৎসাহ দিতে থাকে। এই সঙ্গে বিহারে কোম্পানীর উদ্যোগে লম্বা আঁশের তুলাচাষ প্রবর্তনের চেষ্টাও শুরু হয়। তদুপরি ইতালি থকে বাংলায় গুটিপোকা আমদানি সহ তারা মহীশূরে কাফি এবং তামাক চাষও শুরু করেছিল। কিন্তু উচ্চমানের

কাঁচামাল সরবরাহকারী ভূমিকা পালনে ভারতীয় অর্থনীতিকে উন্নয়নে এই চেষ্টা তেমন কোন সাফল্য লাভ করে নি এর কারণ জীবিকার নিম্নমানের দরুন কৃষকদের প্রচলিত চাষবাসের ধরণ ত্যাগ সম্ভবপর হয় নি। ভারতীয় কৃষকরা তাদের কর ও ভূমিরাজস্ব দেয়ার জন্য প্রায়ই উৎপাদন মূল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন দামে কৃষি দ্রব্যাদি বিক্রী করতে বাধ্য হত। ১৮২০ র ও ১৮৩০-র দশকগুলিতে বেমানম নিষ্কর ভূমি সম্পর্কে ব্যাপক পুনর্বিবেচনার পেক্ষিতে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সামগ্রিকভাবে খাজনা বৃদ্ধি করা হয় এবং তদনুযায়ী বাংলায়ও ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পায় ইতিমধ্যে সেখানে জমিদাররা গ্রামাঞ্চলের মহাজনের ভূমিকাসীন হয় এবং ঋণের সুদ হিবাবে শস্য গ্রহণের রেওয়াজ চালু হয়ে যায়।

ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকগুলিতে ভারতীয় শিল্প বুর্জোয়াদের অভ্যুদয় ঘটে এবং প্রথম কারখানার সঙ্গে প্রথম মানুফ্যাকচারিং সংস্থাগুলিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলি ছিল কলকাতার নিকটস্থ একটি ব্রিটিশ চটকল ও বোম্বাইয়ের একটি ভারতীয় বস্ত্র কারখানা। বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত এবং নতুন অর্থনৈতিক যোগাযোগ দেখা দেয়া সত্ত্বেও কৃষিজাত পণ্যোৎপাদন ছিল খুই নিম্নমানের। ব্রিটিশ সরকার একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ করার চেষ্টা করেছিল অন্যদিকে গ্রাম সমাজ তখন অবক্ষয়গ্রস্থ; পক্ষান্তরে খাজনার মাধ্যমে কৃষকের উপর সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি ও জমির ব্যক্তিগত মালিকানার মজবুতির দরুণ জমিমালিকরা ভাগচাষীদের কাছে জমি ভাড়া দিত ও কৃষকদের অবস্থা প্রায় ভূমিদাস পর্যায়ে অবনমিত হয়েছিল। একদিকে ভারত ব্রিটেনের জন্য কাঁচামাল ও কৃষিদ্রব্য সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে নানাধরনের সামন্ততান্ত্রিক কার্যকলাপ ও জাতীয় উৎপাদনের পথে বহু প্রতিবন্ধক ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশকে প্রহত করছিল।

সমাজ কল্যাণের ব্যাখ্যা

রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা মানব ইতিহাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতি ও সমাজের প্রতিকূল অবস্থা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন উপায়ে মানুষ পরস্পরকে বিপদে আপদে সাহায্য করে আসছে। স্বতঃস্ফূর্ত এই সাহায্য ছাড়া আধুনিক সভ্যতায় মানুষের পক্ষে এতো অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ আছে। এই সাহায্যের অপর নামই সমাজ কল্যাণ।

ইদানীং সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন বা পরিবর্তন শব্দটি বেশ জোরের সঙ্গে প্রয়োগ করা হচ্ছে সর্বস্তরে একথা ভাবলে ভুল হবে সমাজ কল্যাণ আধুনিক সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়েছে। আলাদাভাবে সমাজ কল্যাণ সম্পর্কে বিশেষ পাঠক্রমও চালু রয়েছে।

সমাজ কল্যাণ কর্মসূচী কোন নতুন পরিকল্পনা বা কর্মসূচী নয়। এর ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতনই পুরানো। রাষ্ট্র থেকে শুরু করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত অনেকেই যুগ যুগ ধরে সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা করে এসেছে। এই চিন্তা-ভাবনা সমাজের তালে তালে পরিবর্তিত হয়েছে এবং উন্নত হয়েছে। এছাড়া সমাজ কল্যাণের সঙ্গে এর ব্যবহারিক দিকেরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এবার দেখা যাক সমাজ কল্যাণের সংজ্ঞা সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন লেখক, পণ্ডিত বা সংস্থা কেমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ওয়াল্টার এ. ফ্রিডল্যাণ্ডারের মতে বলা হয়েছে যে সমাজ কল্যাণ সমাজ-সেবার ও প্রতিষ্ঠানের এক সুসংগঠিত পদ্ধতি যা ব্যক্তি ও দলকে এক উন্নতমানের জীবন, স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক লাভ করতে সাহায্য করে। এরই ফলে মানুষ তার পূর্ণ ক্ষমতায় বিকশিত হয়ে তার পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রম উন্নতি লাভ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় সমাজ কল্যাণের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সমাজ কল্যাণ বলতে শুধুমাত্র বিশেষ জীবনের উন্নতিকেই বোঝায় না, সামগ্রিক, দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলজনক অবস্থাই সমাজ কল্যাণ। আরো বলা হয়েছে যে বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সর্বোচ্চ জীবনমান লাভ করা প্রতিটি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। শান্তি ও নিরাপত্তার মূলভিত্তি সব মানুষের কল্যাণ।

জার্ট্রুড উইলসন (Gertude Wilson) সমাজ কল্যাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য সকল মানুষের সংগঠিত প্রচেষ্টাই সমাজ কল্যাণ। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সোশ্যাল ওয়ার্কাস বইয়ে 'সমাজ কল্যাণ' শব্দের অর্থ বলতে স্বীকৃত সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান অথবা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের মঙ্গলের জন্য সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে সংগঠিত যাবতীয় কাজকেই বোঝানো হয়েছে।

উল্লিখিত বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে আধুনিক সমাজে সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীর জন্য চাই সুসংগঠিত প্রযাস। কোনরকম স্বতঃস্ফূর্ত দানশীলতা, বদান্যতা প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী সাহায্য কর্মসূচী নয়, সমাজ কল্যাণ কার্যাবলী কোনরকম বিচ্ছিন্ন সাহায্য দান কার্যাবলী (Charities) নয় যে যখন প্রয়োজন তখনই কেবল সংগঠিত হতে হবে। তবে এই ধরণের স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে দিয়েই এই সংগঠিত সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীর আধুনিককালীন সূত্রপাত। আধুনিককালে সমাজ কল্যাণ কেবলমাত্র দানশীলতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না. তা মানুষের সুখ-দুঃখ, নানারকম চাহিদা এবং নানান সমস্যা সমাধানের জন্যেও মানুষকে সংগঠিত করতে সাহায্য করে। সমাজ কল্যাণ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ধারণা অর্জনের জন্য সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলি ভালভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে এমনই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল।

ক) সমাজ কল্যাণ অসংগঠিত বা অপরিকল্পিত সাহায্য পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নয়। সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্যই হল সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে মানুষকে সাহায্য করে তাদের জীবনে সর্বাত্মক উন্নতি আনা। বস্তুত দানশীলতা ও সমাজ কল্যাণের প্রধান পার্থক্যই সমাজ কল্যাণের সুসংগঠিত একটি রূপ।

খ) সমাজ কল্যাণ মানব সমাজের বিশেষ কোন শ্রেণীর উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণেই সমাজ কল্যাণের লক্ষ্য। কারণ সকল মানুষের কল্যাণই সমাজের উন্নতির চাবিকাঠি। বাহ্যত মনে হতে পারে শুধুমাত্র দরিদ্র বা নিরক্ষর লোকদের জন্যই সমাজ কল্যাণ প্রয়োজন।

গ) মানব জীবনের কোন একটি মাত্র দিক নিয়েই সমাজ কল্যাণের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত সংজ্ঞায় সমাজ কল্যাণের ব্যাপকতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মানুষের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সর্ববিধ দিকের উন্নতি বিধানই সমাজ কল্যাণের লক্ষ্য। সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য এবং সব রকম সমস্যার সমাধানের জন্য বহুমুখী কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন।

ঘ) অতীতে প্রধানত স্বেচ্ছামূলক সাহায্য কর্মের মধ্যেই সমাজ কল্যাণ সীমিত ছিল। বর্তমানকালে স্বেচ্ছামূলক সাহায্য কর্ম অপর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়ায় সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে পরিকল্পিত ও সংগঠিত ধারায় সমাজ কল্যাণ পরিচালিত হচ্ছে। যে কোন সার্থক সাহায্য প্রচেষ্টা নিরাময়মূলক বা শুধু প্রতিরোধমূলক হতে পারে না।

ঙ) সমাজ কল্যাণ একটি সমর্থকারী কার্য। মানুষের বাস্তব সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার জন্যই সমাজ কল্যাণের কাজে নিযুক্ত কর্মীগণ ব্রতী হন।

সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যার সাময়িক সমাধানে সহায়তা করা কল্যাণের উদ্দেশ্য নয়। সমাজ কল্যাণ মানুষের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে তাদের এমনভাবে সাহায্য করতে

ইচ্ছুক যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেরাই নিজেদের চেষ্টায় নিজ নিজ সমস্যার সমাধান করে স্বাবলম্বী হতে পারে। অর্থাৎ সমাজের কোন এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণের কাজ সীমিত থাকে না। সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন করে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সুন্দর, সুস্থ ও সুখী গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য। কোন এক শ্রেণীর মানুষ উপেক্ষিত ও অনুন্নত থাকলে সমাজের সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন হতে পারে না। কেবলমাত্র দুঃস্থ, দরিদ্র ও নিরাশ্রয়ের সাহায্য করাই সমাজ কল্যাণের কাজ নয়, সমাজের ধনী বা উচ্চ শ্রেণীও এর আওতাভুক্ত। কারণ তাদেরও এমন কিছু সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থাকে যা সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীর আওতায় পড়ে।

শ্রীমতি দূর্গাবাই দেশমুখের মতে "সমাজ কল্যাণ হচ্ছে জনসাধণের দুর্বলতর বিপন্ন শ্রেণীর উপকারের জন্য বিশেষ সাহায্য কর্মসূচী এবং নারী, শিশু, বিকলাঙ্গ, মানবিক ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিভিন্ন উপায়ে সামাজিক পঙ্গু মানুষের জন্য বিশেষ সেবাকার্য এর অন্তর্গত"। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন মানুষ যে কোন মুহূর্তে পঙ্গুতা ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারে। সুতরাং সমাজ কল্যাণ এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে ধনী-গরীব নির্বিশেষে। অর্থাৎ সমাজ কল্যাণ শুধুমাত্র গরীব শ্রেণী বা পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য নয়। সমাজ কল্যাণের ব্যাপকতা এইখানে।

চ) সমাজের একটা সমস্যাকে সমাধান করে অন্য সমস্যাকে উপাখ্যান করা যায় না। সমাজ পরিবর্তন শীল, সমস্যাও তাই ভিন্ন। সুতরাং গতানুগতিক কিংবা বাঁধা-ধরা প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণ সম্ভব নয়।

ছ) কখনও হয়ত মানুষের সমস্যা সমাধাণের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন, আবার কখনও হয়ত তাঁর শিক্ষা, উপদেশ বা সচেতনতার প্রয়োজন আবার কখনও হয়ত মানুষকে নেতৃত্ব দানের জন্য নেতৃত্ব গঠনের সহায়তা প্রয়োজন।

জ) আমাদের মতন গরীবদেশে মানুষের যেখানে আশু চাহিদা তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন জোগাড় সেখানে ঐ কাজ ছাড়া অন্য কাজ করার পিছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

দেশের এখনও ৭০ জন মানুষ নিরক্ষর এবং শতকরা ৪০ জন দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন। অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ এবং কু-সংস্কারাচ্ছন্ন। সেই দেশে সমাজ কল্যাণ কাজের ব্যাপকতা অনেক বেশি এবং কাজের সূত্রপাত নির্নয় করাও কঠিন।

ঝ) সুতরাং সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সঠিক ভাবে নির্নয় করা কোন কাজের উপর গুরুত্ব বেশি। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান অর্থাৎ নূন্যতম চাহিদার অধিকারই যদি মৌলিক হয় তাহলে সমাজ কল্যাণ কাজের পরিধি যেমন বাড়ে তেমন আবার এই কাজ করার পিছনে অনেক বেশি ঝুঁকি এবং দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ও বটে।

ঞ) তদুপরি, সমাজ কল্যাণের অর্থ হচ্ছে সকল মানুষকে সুখে এবং সুন্দর সমাজের মধ্যে রাখা।

ট) মানুষের 'নূন্যতম চাহিদা' মেটানোর জন্য ব্যাপকভাবে সমাজ কল্যাণ কাজ করার প্রয়োজন। আর এই কাজ সমাধা করার জন্য ব্যাপক আন্দোলনের প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় স্তরে এই কাজকে তরান্বিত করতে হবে। অর্থাৎ সরকারকেই এই ধরণের সমাজ কল্যাণের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। অবশ্য যে কোন সরকারেরই তার জনগণের প্রতি এই নৈতিক দায়িত্বটুকু থাকে। নচেৎ জনগণ সরকার পরিবর্তন করে ভোটের মাধ্যমে। অতএব একথা পরিস্কার যে কিছু সমস্যা এমনই যে গুলো সরকার ছাড়া সমাধান সম্ভব নয়। আবার ঐ সকল সমস্যা সমাধান না হলেও অন্যান্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

ঠ) সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সুন্দর সমাজ গঠনই নয় বরঞ্চ দেখা সমাজের মৌলিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে কি না। এছাড়া সমাজের বর্তমান সম্পদ ঠিক ঠিক ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, কিংবা মানুষ তার নিজস্ব সম্পদ কিংবা তার আশেপাশের সম্পদকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করছে কি না তা দেখাও সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য। কারণ সমাজ কল্যাণকারী মনে করে মানুষের এমন বহু সমস্যা আছে যা তার নিজস্ব সম্পদ এবং তার চারিপার্শ্বের সম্পদ ব্যবহারের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হতে পারে কিন্তু মানুষ সে বিষয়ে এখনও সচেতন হয়নি।

ভ) সমাজ-কল্যাণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী আছে সেটা হচ্ছে সকল সমস্যা সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুগুলো বন্ধ করা। সমস্যার সৃষ্টি যাতে না হয় তার জন্য প্রতিরোধের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা। অর্থাৎ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো যাতে বার বার সৃষ্টি না হয় তার জন্য মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা, এবং মানুষের নিজস্ব সম্পদের 'সঠিক' ব্যবহার শেখানো, রোগ-মহামারী ইত্যাদি যাতে না হয় তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া ইত্যাদি ও সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য।

সমাজ কল্যাণের লক্ষ্য সমস্যাবিজড়িত মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করা যাতে তারা নিজ চেষ্টায় নিজ নিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে পারে; এবং এই জন্যই সমাজ কল্যাণকে একটি সক্ষমকারী কাজ বলে মনে করা হয়।

সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য মানবজাতিকে তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাহায্য প্রদান করা, বিশেষ করে যে সকল মানুষ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্থে পিছিয়ে রয়েছেন। কিন্তু মৌলিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নেওয়া হয় তা হয়ে ওঠে এক জটিল প্রক্রিয়া কারণ সমস্যাও জটিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথেই এই মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। সুতরাং যে সকল সমস্যা রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখে সেই সকল সমস্যার সমাধান সমাজ কল্যাণ ভূমিকায় সমাধান সম্ভব নয়। কারণ সমাজ কল্যাণ প্রক্রিয়া কেবল বর্তমান সমাজ কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত মানুষকেই সাহায্য প্রদান করে। গোটা সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের অর্থ এক নতুন 'রাজনৈতিক প্রক্রিয়া' চালু করা। মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাকে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জন্য মানষিকভাবে প্রস্তুত করা। এবং ধীরে ধীরে একই সমস্যাভোগী মানুষগুলোকে সমন্বয় সাধন করে সংগঠিত হতে সাহায্য করা। অর্থাৎ সংগঠিত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে তাঁর এবং তাঁর গোষ্ঠীর মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত করা।

যুগে যুগে সমাজ কল্যাণ

প্রাচীন যুগ : ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, মানব সভ্যতার ধাপে ধাপে নানাপ্রকার রূপান্তর, পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণ তার বর্তমানকালের রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে 'গোত্র' বা পরিবার ছিল মানুষের প্রধান আশ্রয়স্থল। পরিবার তার সক্ষম ও অক্ষম উভয় প্রকার সদস্যদের আশ্রয় ও নিরাপত্তাদানে সচেষ্ট ছিল। পরিবারের বাইরেও নানা ধরণের প্রতিকূল অবস্থায় মানুষ একে অপরকে রক্ষা করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত।

বোসার্ড (BOSSARD) বলেন, যে সুদূর অতীতে সমাজ কল্যাণের সূত্রপাত ঘটে। প্রাচীনকালে বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য ছিল আশ্রয় কেন্দ্র (Refugees), দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য ছিল অবৈতনিক বিদ্যালয় (যা এখনও আছে এবং সরকারীভাবেও প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে), দৈহিক শ্রমিকদের জন্য ছিল বিনা পয়সায় খাদ্যদান কেন্দ্র। এছাড়া পুরানো কাপড় চোপড় বিতরণ এবং দরিদ্রের বিয়ে ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যও সাহায্য দানের ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্ষে দানশীলতা ছিল একটি সুপ্রচলিত ব্যবস্থা। প্রাচীন গ্রীসে দানশীলতার জন্য নিয়মিত কোন সংগঠন না থাকলেও সমাজের অসুস্থ ও নিরাশ্রয়দের সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে পরিত্যক্ত শিশু এবং পঙ্গু সৈনিকদের সাহায্য করবার জন্যও ছিল বিশেষ প্রতিষ্ঠান। এথেন্স অসহায়দের সাহায্য করবার জন্য বিশেষ দরিদ্র কর আদায় এবং বিতরণ করা হতো। ভেসী (VESCY) প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজ কল্যাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে খুব সুসংগঠিতভাবে না হলেও বিপদাপন্নদের সাহায্য করা প্রাচীন সমাজে একটি প্রচলিত ব্যবস্থা হিসাবেই পরিচিত ছিল। প্রাচীন চীনে ছিল বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দরিদ্রের জন্য বিশেষ আশ্রয় কেন্দ্র এবং অসহায়দের কাপড়-চোপড় ও খাদ্যদানের

অন্যান্য ব্যবস্থা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অসহায় ব্যক্তিদের আশ্রয় ও নিরাপত্তাদানের জন্য গ্রীসে ও রোম উভয় দেশেই বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল।

মধ্যযুগ ঃ মধ্যযুগে প্রথম পর্যায়ে জনসেবা ছিল বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা গোত্রের মধ্যে সীমিত। কিন্তু ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবাও ব্যক্তিগত বদান্যতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার সীমা অতিক্রম করে সঙ্ঘবদ্ধ ও ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে থাকে। মধ্যযুগে গীর্জা, মঠ, মসজিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দরিদ্রের সাহায্যদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানসিক অনুভূতি, ধর্মীয় প্রেরণা, সামাজিক বাস্তবতা থেকেই সমাজ কল্যাণের ধারণা ও প্রক্রিয়ার উৎপত্তি। ধর্মের দৃষ্টিতে সমাজসেবা একটি পবিত্র কাজ। সমাজের কল্যাণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধর্মেব অবদান অপরিসীম। যেমন দেখা যায় যে ইহুদী ধর্ম দানশীলতা, বিশেষ করে দরিদ্রদের সাহায্য করবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। খ্রীষ্টান ধর্মে দানশীলতাকে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ এবং পরকালে দাতার আত্মার মুক্তিলাভের এক বিশেষ উপায় বিবেচনা করা হয়। হিন্দু ধর্মেও দানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আবার বৌদ্ধ ধর্মে শুধু মানুষ নয়, প্রাণী জগতের সকলের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের নিদর্শন আছে। ইসলাম ধর্মে সমাজসেবার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের চোখে সমাজসেবা সব কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সামাজিক নিরাপত্তা সমাজের এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সমাজ কল্যাণের নতুন এবং পুরানো ধারণার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। অতীতে আছে কল্যাণমূলক কাজ ছিল নিতান্ত স্বেচ্ছামূলক এবং অসংগঠিত। তখন মানুষকে স্বাবলম্বী কবার কোন চেষ্টা না করে তাকে তাৎক্ষণিক সাহায্য কবা হ'ত সমস্যার সাময়িক সমাধান করে। ইসলামের দৃষ্টিতে যে জাতি নিজের ভাগ্য নিজেরা পারিবর্তন করে না, 'আল্লাহ' তার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন করেন না। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে বায়তুল মালের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত মানুষের অভাব মোচনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাঁধে অর্পণ

করা হতো। তখন উপার্জনহীন বা বেকার ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ভাতাদানের ব্যবস্থা ছিল। সেকালের দৃষ্টিতে এটা ছিল রীতিমত বৈপ্লবিক ব্যাপার। কিন্তু বেশী দিন এই ব্যবস্থা টেকেনি। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সমাজ কল্যাণের প্রাচীন ও আধুনিক ধারণার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নতুন সমস্যা দেখা দিতে লাগলো। তখন সমাজসেবার প্রচলিত পদ্ধতি আর সেভাবে কার্যকরী না হতে থাকলে সমাজ-বিজ্ঞানীরা সুংগঠিত উপায়ে মানুষকে সাহায্য করার কথা নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেন। আধুনিক সমাজ কল্যাণ সেই চিন্তারই ফসল।

আধুনিক যুগ ঃ বর্তমানকালের সমাজ কল্যাণের বিবর্তনে গ্রেট ব্রিটেনের দান অপরিসীম। দান নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠনের ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনই সর্বপ্রথমে নানা ধরণের আইন প্রণয়ন এবং পরীক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত গীর্জাই ছিল গ্রেট বিটেনের অন্যতম প্রধান দান বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান। তখন পর্যন্ত সরকার এই ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু সামন্ততন্ত্রে ভাঙন সূচিত হওয়ার পর ইংলণ্ডের সমাজে অসংখ্য নতুন সমস্যা নেমে আসতে থাকে। এই ক্রমবর্ধমান সমস্যার মোকাবিলা করতে গীর্জা ও বিভিন্ন সংঘ যথাযথভাবে সমর্থ না হওয়ায় রাজা ও পার্লামেণ্টকে এদিকে নজর দিতে হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে সর্বপ্রথম সহকারী তত্ত্বাবধানে দরিদ্রদের সাহায্য করবার জন্য গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্ট এই মর্মে আইন প্রণয়ন করে যে—

ক) ভিক্ষা-বৃত্তিনিবিদ্ধ করা,

খ) দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা,

গ) রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা দরিদ্রদের সাহায্য দান।

এরপর ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট বিশেষ দরিদ্র কর আরোপ করে এবং ওভারসিয়ার অব পুওরদের উপর আদায় ও বিতরণের ভার অর্পণ করে।

রাণী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ডের দরিদ্রদের সাহায্য করবার জন্য অনেকগুলি আইন করা হয়। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি দরিদ্র আইন পাস করা হয় এবং ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে এর কিছুটা রদবদল করে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। সুসংগঠিত উপায়ে দরিদ্রদের সাহায্য করা এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের দায়িত্ব গ্রহণে পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে বাধ্য করাই ছিল এই আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের এই দরিদ্র আইনকে কেন্দ্র করে বা অনুসরণ করে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ দরিদ্র আইন গঠন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রথমে ইংলণ্ড ও পরে আমেরিকায় যে দান সংগঠন আন্দোলন (Charity Organisation movement) শুরু হয় তার ফলেই আধুনিক সমাজ কল্যাণের ভিত্তি গড়ে ওঠে।

সমাজসেবাকে সুসংগঠিত করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা চলে গ্রেট বৃটেনে। কিন্তু পেশা হিসাবে সমাজ কল্যাণ পূর্ণতা লাভ করে আমেরিকায়।

বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত দেশে বিশেষ করে পশ্চিমী দুনিয়ায় সমাজসেবার জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে যারা সরকারী এবং সাধারণ মানুষের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন দেশের আয়কর আইনে বলা আছে গরীব জনসাধারণের সাহায্যার্থে কোন ট্রাস্ট বা সোসাইটিকে সাহায্য করলে আয়কর-এ ছাড় আছে। এই ছাড়ের সুবিধায় পশ্চিমী দেশে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গঠিত হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই আর্তদের সেবার জন্য স্মরণার্থীদের ত্রাণের উদ্দেশ্যেও বহু প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন ধনী দেশগুলিতে গড়ে উঠেছে গরীব দেশগুলিকে সাহায্য করার জন্য, অন্যদিকে গরীব দেশগুলির মধ্যেও এক শ্রেণী ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে সমাজ কল্যাণ কার্য। যার উদ্দেশ্য-র প্রেরণা বহুলাংশে ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক। বিস্তারিত আলোচনা পরের পরিচ্ছেদে করা হবে।

প্রাক্-শিল্প যুগে সমাজ কল্যাণ

প্রাক্-শিল্প যুগে সমাজ কল্যাণের সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল, সাহায্য প্রয়াসের বিচ্ছিন্নতা ও ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা। মানুষ প্রথমতঃ ধর্মীয় অনুপ্রেরণা বা মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মঙ্গল কাজে অগ্রসর হতো মানবিক সহানুভূতি বা পারলৌকিক মোক্ষ লাভের জন্য। এই সময় ভিক্ষাদান, বদান্যতা, দানশীলতা, সদকা, খয়রাত প্রভৃতি প্রথায় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রয়াস দেখা যায়। নিচে কয়েকটি প্রাক্-শিল্প যুগে সমাজ কল্যাণের কতিপয় দৃষ্টি ও আলোচনা করা হল।

ক) ভিক্ষাদান (Alms giving) :

দুঃস্থ মানুষের সাহায্যের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত প্রথা পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে ভিক্ষাদান প্রথা অন্যতম। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করার পক্ষে যে উপদেশ দেওয়া আছে বা মানুষ ব্যক্তিগতভাবে অপরকে সাহায্য করার যে তাগিদ নিজের মধ্যে অনুভব করার ফলে তার মধ্যে ভিক্ষাদানের ইচ্ছা আসছে সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ভিক্ষাদান ব্যক্তিকেন্দ্রিক দানশীলতার অঙ্গ হিসাবে আগাগোড়া পরিচিত এবং ভিক্ষুকরা ধর্মের নামে ও নিজের কোন অসহায়তার প্রতি মানুষের করুণা আকর্ষণে যথেষ্ট সচেষ্ট থাকে। যদিও ভিক্ষুকদের এই অবস্থার জন্য প্রচলিত অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থাই যে দায়ী সেদিকে অঙ্গুলী নির্দেশ না করে বলা হয় যে, ভিক্ষাবৃত্তির কারণ অতীতের কৃত-কর্মের ফল। আবার, অন্যদিকে শাসক বা ধনী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয় যে ঈশ্বর যে ধনরত্ন দিয়েছে তার কিছু অংশ গরীব আর্তদের মধ্যে দান বা ভিক্ষা না দিলে ঈশ্বর খুশী হবেন না। অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলা যায় যে শোষণের কিছু অংশ যদি দান ভিক্ষার মধ্যে না বন্টন করা হয় তবে গরীব জনতা বিক্ষোভ-বিদ্রোহ প্রদর্শন করবে। সুতরাং, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বা নিজের মহত্ব যদি প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে ভিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। যদিও আধুনিক যুগে ভিক্ষুকরা যেমন করুণা আদায় বা আকর্ষণ করতে পারে না তেমনি ভিক্ষা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখাও যায় না।

খ) বদান্যতা বা দান (Charity) :

বদান্যতা মানব সমাজের অন্যতম প্রাচীন প্রথা। দুঃস্থ মানুষকে সাহায্য করার যে প্রথা সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে তাকেই বলে Charity।

শব্দটি ল্যাটিন Charitia's শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ ঈশ্বরের প্রেম বা মানব প্রেম। মানুষের প্রতি প্রেম-করুণা বা সহানুভূতি-বশতঃ মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় যে সাহায্য করা হয় তাকেই বদান্যতা বলে। ভিক্ষাদানের সঙ্গে বদান্যতার অন্যতম পার্থক্য এই যে, ভিক্ষাদানে করুণা বা সহানুভূতি অপরিহার্য নয়, বদান্যতায় এটাই অপরিহার্য। বদান্যতা বা দান শুধুমাত্র বৈষয়িক সাহায্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর উপর ভিত্তি করে হাসপাতাল লঙ্গরখানা প্রভৃতি সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

হিন্দুধর্মে অর্থদান ছাড়াও বিদ্যাদান ও অভয়দান অন্যতম কল্যাণ-মূলক কাজ। ইসলাম ধর্মে দানশীলতা সদ্গাহ ও খয়রাত নামেও অভিহিত। তবে সমস্ত ধর্মেই দান ও বদান্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ) দানশীলতা (Philanthorpy) :

দানশীলতা, বদান্যতা ও দান প্রায় সমার্থক শব্দ। বদান্যতায় বৈষয়িক দান ছাড়াও নানান কল্যাণমূলক কাজকে যুক্ত করা হয় কিন্তু দানশীলতায় (Philanthorpy) শুধুমাত্র পরহিত ব্রতদান কার্যকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ঘ) দুঃস্থ নিবাস (Alms house) :

যে জায়গায় দুঃস্থ অসহায় মানুষকে আশ্রয় দেওয়া হয় তাকেই দুঃস্থ নিবাস বলে। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের এলিজাবেথীয় আইন অনুসারে ইংলণ্ডের সমস্ত দরিদ্র জনসংখ্যাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এদের মধ্যে যারা বার্ধক্য, পঙ্গুতা বা অসুস্থতার জন্য কর্মে অক্ষম ছিল তাদের আশ্রয়দানের জন্য দুঃস্থ নিবাস খোলা হয়। এই প্রথা পরবর্তীকালে আমেরিকায় চালু করা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও দুঃস্থ নিবাস চালু হয়। এছাড়া অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন নামে চালু হয় এই দুঃস্থ নিবাস।

ঙ. জাকাত (Zakat) :

জাকাতের অর্থ পবিত্রকরণ। ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধভাবে অর্জিত সম্পদও বিশেষ সীমার উপরে গেলে জাকাত না দেওয়া পর্যন্ত ঐ সম্পত্তি ঐ ব্যক্তির জন্য অবৈধ থাকে। জাকাত দান, দক্ষিণা নয়। বাধ্যতামূলকভাবে দাতার দায়। খেয়ালখুশীর উপর নির্ভরশীল কোন দান নয়। জাকাত একদিকে ধনীদের জন্য যেমন একটি কর, অন্যদিকে তেমনিই দরিদ্রের জন্য একটি অধিকার। প্রাক্ শিল্পযুগ থেকেই এটা চলে আসছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে দরিদ্র অনাথদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করাই জাকাতের উদ্দেশ্য। আট শ্রেণীর লোক জাকাতের সাহায্য ভোগ করতে পারে। যেমন—
১) দরিদ্র ২) আশ্রয়হীন ও অভাবগ্রস্থ ৩) ঋণগ্রস্থ ৪) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ৫) বিপদগ্রস্থ পথিক ৬) দাস ও বন্দী ৭) জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণকারী কর্মচারী ৮) আল্লার পথে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি।

চ. ওয়াকফ্ (Wakf) :

কোন মুসলমানের সম্পত্তি ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজে স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করাকেই ওয়াকফ বলে। এই সম্পত্তি ধর্মীয় শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ওয়াকফ্ দুই প্রকার—ক) ওয়াকফ্ ই খায়রি, খ) ওয়াকফ্ ই আহলি। ওয়াকফ্-ই-খায়রির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জনসাধারণকে সাহায্য করা এবং ওয়াকফ্-ই-আহলিতে ওয়াকফ্কারীর আত্মীয়-স্বজনের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করা চলে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এই প্রথা নানারকম সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে আসছে। ওয়াকফ্ কৃত সম্পত্তির আয়ে পরিচালিত বহু মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ এ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে দেখা যায়।

ছ. দেবোত্তর প্রথা :

ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় সর্বসাধারণের কল্যানার্থে সম্পত্তি উৎসর্গ করার যে প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে তাকেই দেবোত্তর প্রথা বলে।

পাপমুক্তি বা পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে এই প্রথা মতে সম্পত্তি দেবতা বা কোন বিগ্রহের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। সাধারণত এই সম্পত্তি কোন বিশেষ দেবতার পূজা ও সংরক্ষণে নিবেদিত হয়। অনেক সময় সম্পত্তি সেবাদাস বা সংরক্ষক ভোগ করে। মুসলমান সমাজের ওয়াকফ্ প্রথার সঙ্গে এর অনেক মিল আছে।

জ. অনাথাশ্রম (Orphanage) :

অতি প্রাচীনকাল থেকে যেসব সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে চলে আসছে তারমধ্যে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা তার সঙ্গে অন্যতম। পৃথিবীর যেকোন দেশের সমাজে অনাথদের জন্য সেবা ও সংরক্ষণের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যদিও আজকাল এই ধরণের সেবা কমছে। স্বেচ্ছামূলক দান ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বহু অনাথাশ্রম পরিচালিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অনাথাশ্রমগুলি অনাথদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির ভার নিয়ে থাকে। ভারতবর্ষে সরকারী এবং বেসরকারীভাবে বহু অনাথাশ্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ঝ. ধর্মগোলা :

ধর্মগোলা এমন একটি প্রথা যার দ্বারা ফসল সংগ্রহের মৌসুমে কৃষকদের কাছ থেকে সাধ্যমতন ফসল দানস্বরূপ সংগ্রহ করে রাখা হয় এবং দুর্দিনের সময় বিনা সুদে তা কৃষকদের ঋণ বা ধার দেওয়া হয়। এই প্রথা ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন সমাজ কল্যাণ প্রথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় খাদ্য সমস্যা জটিল আকার ধারণ করলে এই ধর্মগোলা স্থাপন করার জন্য গ্রামে গ্রামে নির্দেশ দেওয়া হয় 'ফুড কমিটি' স্থাপনের জন্য। এই কমিটিগুলি জেলা ও মহকুমার প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। গ্রামের লোকদের নিয়ে ফুড কমিটি গঠন করা হোত ও তারাই ধান সংগ্রহ, বিতরণ ও হিসাবপত্রাদি রক্ষণা-বেক্ষণ করতো কিন্তু আধুনিক সমাজে ধর্মগোলা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ঞ. লংগরখানা :

প্রাক্ শিল্প যুগে ভারতবর্ষে জাতি-ধর্ম-নির্বিশিষে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য বিরতণ করার জন্য গ্রামে গ্রামে লংগরখানা খোলা হোত। মধ্যযুগে সেগুলি সাধুসন্ন্যাসীদের দ্বারা এবং তাদেরই জন্য পরিচালিত হত। সেই সময় কোন কোন শাসক (যেমন শেরশাহ) সরকারী উদ্যোগে লংগরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানকালেও সরকার কোন বিশেষ বিশেষ কারণে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অগ্নিকাণ্ড বা যুদ্ধ চলাকালীন শরণার্থীদের জন্য লংগরখানা খুলে থাকেন। কখনও কখনও স্থানীয় জনসাধারণের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রচেষ্টায় এই লংগরখানাগুলি খোলা হয়।

আধুনিককালে পাড়ার বা মহল্লার ক্লাব। সমিতিগুলি কখনও কখনও লংগরখানা খুলে থাকেন। বিশেষ করে বারোয়ারী পূজা সমিতিগুলি দরিদ্রনারায়ণ সেবা করে থাকেন এবং আশে-পাশের বস্তি অঞ্চলের গরীবদের খিচুরী খাওয়ান। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাও ধীরে ধীরে কমছে।

ট. সরাইখানা :

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল থাকায় পথচারীদের খুবই অসুবিধা বা কষ্টে পড়তে হত। পথে পিপাসা বা ক্ষুধা মেটাবার জন্য ও রাত্রি যাপনের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান বা হোটেল জাতীয় ব্যবস্থা ছিল না। সে কারণেই বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা প্রজাদের সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তার ধারে সরাইখানা নির্মাণ করাতেন। সেখানে ক্লান্ত পথচারীরা আশ্রয় নিতেন। কিন্তু আধুনিককালে এগুলি আর নেই, এমনকি সরকারীভাবেও কোন সরকারী সরাইখানা পরিচালিত করা হয় না।

সমাজ কল্যাণ কার্যে ধর্মের প্রভাব

মানুষ ও তার সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব বহু প্রাচীন এবং বাস্তব সত্য। সভ্যতার বিকাশে মানুষেব মনে ধর্ম ভাবনার উদয় এবং তার কঠোরতা প্রাপ্তি এক কঠিন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। মানুষের বিচার বুদ্ধি ও যুক্তির প্রাথমিকতম পর্যায়ে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে অথবা সমঝোতায় যে ঐশ্বরিক চিন্তা এবং ধর্ম ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের জ্ঞান. বিজ্ঞান ও যুক্তির উৎকর্ষের যুগেও তা প্রবলভাবে বিদ্যমান[১]।

মানব-সমাজ বিকাশে বিভিন্ন ধর্মের যে উদয় ঘটেছিল প্রাথমিক স্তবে সেই ধর্মমতগুলির অন্যতম ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল সমাজের দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। কিন্তু সমাজ বিকাশের অগ্রগতি, সমাজের শ্রেণী-বিভাজনের তীব্রতায় সেই ধর্মমতগুলি প্রধানত সমাজের সুবিধাভোগী ও শাসক সম্প্রদায়গুলির দ্বারা আপন স্বার্থ রক্ষাতেই ব্যবহৃত হয়েছে।

সমাজের নিচের তলার নিষ্পেষিত মানুষদের ধর্ম ভাবনায় আচ্ছন্ন করে বেখে উপরতলার সুবিধাভোগীরা ধর্মকে অত্যন্ত স্থূলভাবে শোষণ ও বঞ্চনার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। ফলে ধর্ম ভাবনা অধঃপতিত হয়েছে ধর্মান্ধতায়।[২]

পৃথিবীর ইতিহাসে কি খৃষ্টান, কি হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা ইসলাম সব ধর্মেরই মূল কথা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ। ঈশ্বরের সেবা করলে, ঈশ্বরকে স্মরণ করলে সব দুঃখেরই মুক্তি লাভ সম্ভব। রোগ জরা, ব্যাধি মৃত্যু সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হতে হবে। সেই সাথে যেটা বেশি করা প্রয়োজন কর্তব্য স্বরূপ তাহলো দারিদ্র পীড়ন আগের জন্মের 'পাপের ফল' স্বরূপ স্বীকার করা এবং পূর্ণকার্য এ জন্ম করে পরবর্তী জন্মে সুখের জীবন-যাপন করা। এছাড়াও সমাজের মানুষকে ঘৃনা না করা এবং ঈশ্বর সৃষ্টি সব মানুষই সমান অতএব শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই ফলে শ্রেণী সংগ্রামেরও প্রয়োজন ধর্মে কোন স্থান দেয় নি। সেবাই ধর্মের মূল মন্ত্র, ব্রাহ্মণ

সেবা, রাজার সেবা এবং ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত দূত সেবাই হচ্ছে মানুষের প্রধান কর্তব্য। সর্বধর্মই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় যখন দুঃখ দুর্দশা চরমে, দাস প্রথা ও সামন্ত ব্যবস্থা নিজের স্থান করে নিচ্ছে সমাজে শোষণ-ব্যবস্থা কায়েম করার। অভিজাত শ্রেণী ও দরিদ্র শ্রেণী ইত্যাদি দুই শ্রেণীতে মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই ধর্ম যেমন মানুষের কাছে হতাশা দুর্দশা থেকে মুক্তি পরিত্রাতা রূপে প্রাথমিক পর্যায়ে আশা জাগিয়েছিল ঠিক তেমনি অল্প-সময়ের মধ্যেই এই ধর্ম মানুষের প্রগতিশীল চিন্তাকে এবং কার্যকলাপের প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে রেখেছিল ধর্ম গোড়ামী আর কু-সংস্কার বদ্ধ ভাবনায়। তত্ত্বপরি, ধর্ম সৃষ্টি থেকেই মানুষ সমাজে অনেক বাস্তব জ্ঞানের উপলব্ধি করিয়েছে। মানুষের জীবনে এক নিয়ম শৃঙ্খলার সৃষ্টি করে'ছ। মানুষের মনকে বেঁধে রেখেছে বিশেষ এক লক্ষে। সভ্যতার অগ্রগতিতে ধর্মের অনেক অবদান আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজের অগ্রগতি একমাত্র কারণ ধর্ম একথা অবিশ্বাসযোগ্য।

সভ্যতার বিকাশে মানব সমাজে শ্রেণী বিভাজন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। দাস শ্রম, ভূমিদাস ব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক সমাজে মজুরি শ্রমের ব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা সমগ্র সমাজেই সম্পত্তি এবং উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকরা উৎপাদন কারীদের শোষণ লুণ্ঠন করেছে। আর পরস্পরবিরোধী এই দুই শ্রেণীর সংঘাতের মধ্যে দিয়েই সমাজ বিকাশের অগ্রগতি ঘটেছে।

এই বিকাশের উপলব্ধির স্তরে যে ভাবনা গুলি কাজ করেছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হল সমাজ কল্যাণ। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আমরা দেখতে পাই মানুষকে কিভাবে ধর্ম তার প্রতিবেশী, আর্তনাদ, দুঃখী এবং দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ করতে উৎসাহীত করেছে এবং আজও করছে।

সূত্র : ১। ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ— সুকোমল সেন, প্রস্তাবনার অংশে।

২। ঐ ৩। ঐ

আমাদের আলোচনা সীমিত রাখার জন্য মূল কয়েকটি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব। হিন্দু খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকছি। এই ধর্মের পুঙ্খাণুপুঙ্খ বিচার করারও কাজ আমাদের আলোচ্য নয় অতএব ধর্মের যে যে অংশে সমাজ কল্যাণের কথা আছে সেগুলো নিয়েই কেবল আলোচনা করা হল এই পরিচ্ছেদে।

১। হিন্দুধর্মের অবদান :

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে আর্যরা আসে। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ বেদকে হিন্দুধর্মের মূল ধরা হয় বলে হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্ম বলে পরিচিত। পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজে কঠোর বর্ণপ্রথার উদ্ভব হলেও আদি বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথা অনেক নমনীয় ছিল। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে লোকেরা একেশ্বরবাদী ছিল এবং সমাজে একটি ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় ছিল।

হিন্দু ধর্মের মতে, "জনসেবা কেবলমাত্র সামাজিক কর্ত্তব্য বা পুণ্যকার্য্য নহে। ইহা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ঈশ্বর প্রাপ্তি সাধনার চরম সোপান অর্থাৎ ধর্মের অন্যান্য অনুশাসন ও নিয়ম পালন করিয়া সাধক দেবত্বের স্পর্শ লাভ করিবার পর ও মোক্ষ বা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আরও কিছু বাকী থাকিয়া যায়; তাহা হইতেছে 'লোকসংগ্রহ' বা 'সর্বভূতহিত' সাধন।"

হিন্দুধর্মে আরও উল্লেখ আছে, "আর্ত্তমানবের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য করনীয় কিছুই নাই, ইহাও সত্য নহে"। বস্তুতঃ সর্বজীবের সেবা হিন্দুধর্মের প্রথম এবং শেষ সোপান। ঈশ্বরতত্ত্বের বর্ণপরিচয়— ঈশোপনিষদের—প্রথম মন্ত্রেই, কোন বস্তু ভোগ করার আগে অপরের অন্য ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া আছে। এই নির্দ্দেশরই বিস্তার করে গীতায় বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি শুধু নিজ উদর পুরণার্থ রন্ধন করে, সে পাপরাশি ভক্ষণ করিয়া থাকে; অপর পক্ষে যে ব্যক্তি দেবমানবাদিকে অন্নপ্রদানরূপ যজ্ঞ করিয়া সেই যজ্ঞের অবশিষ্টাংশের দ্বারা নিজের প্রাণরক্ষা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। এই একই

কথার পুনরাবৃত্তি করে মনু, গৃহস্থকে প্রতিদিন অপরকে ভোজন করাইয়া, কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, তাহাই অমৃত জ্ঞানে নিজ প্রান রক্ষার জন্য গ্রহণ করিতে বলেছেন। পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে 'নৃযজ্ঞ' অর্থাৎ মানুষের সেবা অন্যতম এবং এজন্যই মানুষের সেবাকে নর-সেবা না বলে 'নর-নারায়ণ সেবা' বলা হয়ে থাকে। কারণ, মনে করা হয় প্রত্যেক মানুষের ভিতর নারায়ণ অধিষ্ঠিত থাকলে, সেই বোধেই মানুষের সেবা করা উচিত।

হিন্দু ধর্মমতে "লোকসেবা একটি সামাজিক কার্য্য বা সুকৃতি অর্জনের উপায়মাত্র নহে; ইহা স্বীয় আত্মার মুক্তির উপায়গুলির মধ্যে অন্যতম এবং এই জন্যই ব্রহ্মোপাসনার জন্য ইন্দ্রিয়নিরোধ, সমবুদ্ধি এবং সর্বভূত-হিত সাধন, সব কয়টি একত্র নির্দ্দেশিত হইয়াছে"।

ছান্দোগ্যের ঋষি দানকে ধর্মের প্রথম সোপানের মধ্যে অন্তর্গত করে ধর্মসাধনায় এর গুরুত্ব নির্দেশ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য দানকে নিয়মের অন্যতম অঙ্গরূপে অভিহিত করেছেন। গীতায় দানকে অন্যতম বলা হয়েছে। কোনরূপ ফল বা উপকার কামনা না করে বা কষ্টবোধ না করে, 'লোকহিতার্থ' এবং কর্তব্যবোধে দান করলে মমত্ববোধ ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। এই জন্যে দানকে পুরুষ যজ্ঞের দক্ষিণা বলা হয়েছে। মণুসংহিতায় দানকেই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম বলা হয়েছে, কারণ যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের আয়ু কম হওয়ায় এবং ধর্মের প্রভাব কমে যাওয়ায়, তপস্যা, জ্ঞান বা বৈদিক যজ্ঞ, যে সকল ধর্মানুষ্ঠান সত্য-ত্রেতা দ্বাপরের যুগধর্ম ছিল, সেগুলি কলিতে দুঃসাধ্য বা অনুপযোগী হয়েছে। শাস্ত্রানুযায়ী যথেষ্ট দান হয় বলেই দান সম্পর্কে কতগুলি অনুশাসন বা দানের সর্ত্ত তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ও গীতায় পাওয়া যায়। দানের সার্থকতার জন্য সর্ত্তগুলি :—

ক) যে ধন দান করবেন তা যেন ন্যায়ার্জিত হয়। অর্থাৎ ডাকাতি, চুরি বা অসৎ উপায়ে অর্থ অর্জন করে দরিদ্রকে দান করলে তা দান বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

খ) দান যতটুকুই হোক না কেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করতে হবে।

গ) সামর্থ্যানুসারে দান করা প্রয়োজন। কারণ অপরের কাছে ঋণী হয়ে দান করলে দান গ্রহীতা কখনই সুখী হবেন না।

ঘ) বিনয় ও নম্রভাবে দান করা উচিৎ। অর্থাৎ দানের মাধ্যমে অহংকার বা ধনীবোধ বা মহত্তের প্রকাশ না পায়।

ঙ) দান গ্রহীতাকে মিত্র ভেবে দান করতে হবে। উচু নীচু ভেদা-ভেদ যেন দান করার সময় না করা হয়। তাহলে দাতার সাধনার বিচ্যুতি ঘটবে।

চ) অযোগ্য ব্যক্তি (মাতাল, দুশ্চরিত,) বা যার প্রয়োজন নেই এমন ব্যক্তিকে দান নিন্দনীয়।

ছ) যজ্ঞার্থে দানই সবচাইতে প্রশংসনীয় কারণ বিধাতা সমস্ত ধনই যজ্ঞ বা বিশ্বকল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

অর্থাৎ হিন্দুধর্মে দান কার্যকে এক কঠিন তপস্যার সমতুল্য করে দেখান হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মত্যাগী ব্যক্তিকে দান করলে নরকে বাস কিংবা রাজা-মহারাজার যজ্ঞে দান শ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সূত্র : গীতা, বেদ, উপনিষদ, মনুবসংহিতা, মানব সমাজ ও হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

২। বৌদ্ধ ধর্মের অবদান :

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এর পূর্বে আর্যদের প্রবর্তিত বৈদিক ধর্ম ক্রমশঃ তার কল্যাণময় রূপ হারিয়ে ফেলতে থাকে। সংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিতদের জন্য ধর্মের মূল ভাবের জায়গায় দেখা দিতে থাকে মানুষে মানুষে বিভেদ ও শোষণের প্রতিমূর্তি বা বিকৃত বর্ণবোধ। ব্রাহ্মণদের অর্থদান করলেই মুক্তিলাভ সম্ভব, শুদ্ররা জন্মগতভাবেই নিম্নতর মর্যাদার অধিকারী এইসব ভুল ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপেই বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয়। গৌতমবুদ্ধ পুরোহিত ব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকার বর্ণপ্রথা, এমনকি বেদের শ্রেষ্ঠত্বও অধিকার করেন। সুতরাং মানুষের সমানাধিকার এবং

সার্বজনীন কল্যাণ প্রথম থেকেই বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন বহুর কল্যাণের জন্য এবং বিশ্বের প্রতি মমতা সহকারে দেবতা ও মানুষের সেবা ও মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হতে। বৌদ্ধের মতে প্রকৃত ধর্ম হল অপরকে যথাসাধ্য কম কষ্ট দেওয়া এবং অন্যের মঙ্গল সাধন, প্রেম, করুণা, সত্য ও পবিত্রতার যথাসাধ্য অনুশীলন। বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ লাভের উপায় হিসাবে যে আটটি উপায়ের নির্দেশ আছে সেগুলো হল সৎ দৃষ্টি, সৎ আশা, সৎ কর্ম, সৎ জীবিকা, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ মানসিকতা এবং সৎ নিষ্ঠা। সুতরাং এটাই স্পষ্ট যে বৌদ্ধধর্মে সব সময় কল্যাণ কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই প্রথমে মানুষ যেটা বেশী দখল করল সেটা হল ভূমি। একশ্রেণীর মানুষ ভূস্বামী হল আর বহু মানুষ ভূমিহীন হয়ে পড়ল। ফলে সমাজের মধ্যে যে পুরাতন গ্রাম্য সমাজ ছিল তার ভাঙন ধরল গৌতম বুদ্ধের সময় খ্রীষ্টিয় নবম শতাব্দীতে মুনে-চেনপো, তিব্বতীয় সম্রাট, সমাজের দারিদ্র ও অসন্তোষ দূর করার জন্য নিজের সম্পত্তিকে সংঘে নয়, সকলের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ নিজে সম্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে বিতরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁর আদর্শ ছিল—সম্পত্তির সাংঘিকরণ, অর্থাৎ সম্পত্তির উপর সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সংঘকে ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক উচু বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে সংঘের স্বার্থ, অন্ততঃ ভোগবস্তুর অধিকার সম্পর্কে, ব্যক্তি স্বার্থ অপেক্ষা মূল্যবান ছিল। একদিন প্রজাপতি গৌতমী একজোড়া ধূসূসা বস্ত্র বিশেষ নিয়ে বুদ্ধকে বলেছিলেন এই ধূসূসা দুটো আমার নিজের কাটা সুতোর তৈরী ; এর বয়নও আমি নিজে করেছি....হে বুদ্ধ, তুমি এই বসন দুটিকে স্বীকার কর। বুদ্ধ উত্তর দিলেন, গৌতমী, এটা সংঘকে দান করুন সংঘকে দিলেই আমিও সম্মানিত হব এবং সংঘও কৃতার্থ হবে। গৌতমী আরও অনুনয় করলে, বুদ্ধ পরে বললেন, কোন ব্যক্তিকে দান, আমি সংঘকে দানের চেয়ে শ্রেয়তর মনে করি না। বুদ্ধ শেষে

গৌতমীর আনা বস্ত্র, সংঘকেই দান করেছিলেন। অর্থাৎ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিস্কার হয় বুদ্ধর সাম্যবাদী চিন্তা। সমাজের উপর মানুষের জন্য তার প্রভাব কতখানি কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বুদ্ধর সাম্য সংঘনীতি অচল হয়ে পড়ল। কারণ বুদ্ধ যেমন সমান বণ্টনের কথা বলতেন, তেমন সমান উৎপাদনের কথা বলেন নি, এবং দাসপ্রথা সামন্তপ্রথার বিরোধীতাও তেমনভাবে করেন নি বরঞ্চ সমাজে ভিক্ষুক থাক এবং তাদের জন্য নিয়মনীতি নির্ধারণও করেছিলেন। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না, ভিক্ষুকদের জন্য কয়েকটি নিয়ম করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। বুদ্ধের নির্দেশ অনুযায়ী ভিক্ষু ৮টি জিনিস তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে রাখতে পারেনঃ—

১) একটি ভিক্ষাপাত্র, ২) তিনটি পরিধেয় কাপড়, ৩) বস্ত্র বিশেষ, ৪) নিয়ম চর্চা; ৫) একটি সূঁচ, ৬) একটি ক্ষুর; ৭) একটি কটিবন্ধ এবং ৮) একটি জলপাত্র।

এই আটটি বস্তুর অতিরিক্ত সমস্ত বিষয় বস্তুর মালিক সংঘ হত। অর্থাৎ তাঁর ধর্মের বাণী যেমন বৈষয়িক সাম্যের কথা উল্লেখ করেছে তেমনি উল্লেখ করেছে মানুষকে ভালবাসতে। মানুষের কষ্টে পাশে থাকতে কিন্তু সেই সময়কার সামাজিক অবস্থান দাস ও সামন্ত সমাজ ভাঙার কোন প্রস্তাব তিনি দিতে পারেন নি।

বুদ্ধদেব মানুষকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন 'অষ্টমুখমার্গ' অনুসরণ করতে, চর্চা করতে সঠিক মতামত, সঠিক আচরণ, সঠিক প্রয়াস, সঠিক বাক্য, সঠিক চিন্তার, ইত্যাদি। উপরোক্ত এই নীতিগুলিই ছিল বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতার অন্তঃসার। বুদ্ধদেবের শিক্ষা অনুযায়ী, মানুষ এই সঠিক পথের যথাযোগ্য অনুসরণকালে সম্পূর্ণভাবে নিজের ওপরই নির্ভর করবে, বাইরে থেকে নিরাপত্তা, সাহায্য ও মুক্তিলাভের প্রত্যাশী হবে না। 'ধম্মপদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মানুষ সেচ্ছায় অন্যায় করে, পাপ কাজ করে, সেচ্ছায় নিজের অধঃপতন ঘটায় সে। আবার সেচ্ছায় মানুষ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে, নিজেকে শোধন করাও তার ইচ্ছাধীন। একজন মানুষ কখনোই অপরকে সংশোধন করতে পারে

না। যদিও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছে যে জন্মকালে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান এবং বৌদ্ধ সংঘের গণতান্ত্রিক চরিত্রও এই মতের পরিপোষক, তবু কোনোদিক থেকেই বৌদ্ধধর্মকে আমূল সংস্কারকামী সামাজিক আন্দোলন বলা যায়না। বৌদ্ধধর্মের উপদেশাবলীতে সকল জাগতিক দুঃখকষ্টের বোঝা, পার্থিব জ্বালা-যন্ত্রণা ও সামাজিক অন্যায়ের কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে মানুষের নিজস্ব 'অন্ধতা'কে এবং পার্থিব বাসনা-কামনা নির্বাপণে মানুষের অসামর্থ্যকে। বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, জাগতিক দুঃখকষ্টকে অতিক্রম করতে হয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নয় বরং উল্টো' বহির্জগতের ব্যাপারে সকল প্রতিক্রিয়াকে নির্বাপিত করে, অহং সম্বন্ধে মানুষের সকল সচেতনাকে বিনষ্ট করে

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের যখন বিকাশ ঘটে তখন ভারতীয় সমাজ মূল দুই শ্রেণী অর্থাৎ ধনী-গরীব, শাসক-শাষিত, শোষক-শোষিত, এবং উঁচু নীচু হিসাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের উপর চলেছে নিপীড়ন আর অত্যাচার ঠিক সেই সময় খ্রীষ্টধর্মের মতন বৌদ্ধ ধর্মও এই অত্যাচারিত ও শোষিত গরীব শ্রেণীর (দাস, শুদ্র এবং অচ্ছুদ) মানুষকে হতাশা, বিক্ষোভ আর হিংসার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ধর্মের বাণী শোনাতে থাকে। এমনকি এই দুঃখ দূর্দশা থেকে মুক্তি পেতে হলে অর্থাৎ পরের জীবনে সুখ কিংবা জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার স্বাদ ও স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন। বুদ্ধ জাতি-ভেদাভেদ প্রথা, দাস প্রথা বিলোপের কোন কথাই বলেন নি। বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে চণ্ডাল ও শুদ্রদের সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি বৌদ্ধ সংঘে এই দাসদের ব্যবহারের উল্লেখ বহু আছে।

৩। খ্রীষ্টধর্মের অবদান :

খ্রীষ্টধর্মেও মানব প্রীতি, মানব সেবা, ভ্রাতৃত্ব ও অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যীশুর দৃষ্টিতে সমগ্র মানব সমাজ এক অভিন্ন পরিবার স্রষ্টার পিতৃত্বের অধীনে পৃথিবীর সকল মানুষ সকলের ভাই। খ্রীষ্টধর্মে মানুষে মানুষে বিভেদ দেখানো হয়নি। এখানে সব অবিভাজ্য ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ কারণ সকলেই এক পিতার সন্তান। খ্রীষ্টধর্মে

মানব প্রেম, সহানুভূতি ও ক্ষমাশীলতাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যীশুর মতে স্রষ্টার সেবার অর্থ বিশ্বপালকের সেবা অর্থাৎ এই সেবার লক্ষ্য বিশ্ব মানবতার সেবা।

দয়া-দান সম্পর্কে যীশু খ্রীষ্টের বাণী। নম্র ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাঁরাই স্বর্গের অধিকারী হবেন। যাঁরা বিনয়ী তাঁরাও ধন্য কারণ এই পৃথিবী তাঁদেরই জন্য। শোকার্তরা ধন্য, কারণ তাঁরা পাবেন ঈশ্বরের স্বান্তনা। যাঁরা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে আগ্রহী তাঁরা ধন্য, কারণ তাঁরা পরিতৃপ্ত হবেন। দয়াবান মানুষ ধন্য, কারণ তাঁরাই লাভ করবেন ঈশ্বরের দয়া। যে লোক তোমার কাছে চায়, তাকে নিরাশ কোরো না। তোমার শত্রুকেও ভালবাসবে। যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের ঘৃণা না করে তাদের জন্য প্রার্থনা করবে। তবেই তোমরা পরমপিতার প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠবে। মানুষের প্রশংসা কুড়োবার লোভে, লোক দেখানো ধর্ম-কর্ম বা দান-ধ্যান কোরো না। তোমরা যখন দান কববে ঢাক পিটিয়ে তা কোরো না। ভণ্ডলোকেরা, লোকের প্রশংসা পাবার আশায় সমাজ-গৃহে, পথে-ঘাটে ঐভাবে ভিক্ষা দেয়। তুমি যখন দান করবে, এমনভাবে গোপনে করবে, যাতে তোমার বাঁ হাতও জানতে না পারে ডান হাতটা কি করছে। যদি সবার থেকে উন্নত হতে চাও, তাহলে দাসের মতো সকলের সেবা করো।

(বাইবেলের 'নতুন ধারা' থেকে সঙ্কলিত)

যীশু খ্রীষ্টের উল্লেখিত বাণীগুলি থেকে প্রমাণ হয় এই ধর্ম মানুষকে কল্যাণ কার্যে কতখানি অনুপ্রানিত করেছে। নিয়ম-নীতি, সমাজের মধ্যে ধর্মভীরু চিন্তা মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে যেমন অনুপ্রানিত কবেছিল তেমনি এই সমাজের নিপীড়িত মানুষকে হতাশা থেকে মুক্তির বাণীই শুনিয়েছিল তদুপরি, অভিজাত শ্রেণী, রাজা-মহারাজাদের সুযোগ করে দিয়েছিল তাদেব শোষণ অব্যাহত রাখার। আবার অন্যদিকে মানুষকে এক প্রাণ, এক চিন্তায় মগ্ন করার জন্য যাজক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে দীক্ষার কাজ প্রসার করেছিল এই খ্রীষ্টধর্ম।

মধ্যযুগীয় বর্বর ও উৎশৃঙ্খল জীবন যাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত মানুষকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হবার সুযোগ দেওয়া, দুঃখ-

ভারাক্রান্ত, নিপীড়িত, হতাশ মানুষকে পরকালের স্থায়ী আনন্দ ও সুখের কথা শুনিয়ে সান্তনা দেওয়া ধর্ম-জীবনের ঐক্যের দৃষ্টান্তকে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রেরণা হিসাবে উপস্থিত করাই ছিল মধ্যযুগের প্রথম পর্বে খ্রীষ্টধর্মের প্রধান কাজ। মানুষের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক বোধবুদ্ধি জাগরণের প্রচেষ্টায় খ্রীষ্টের বাণী প্রচারই ছিল এই পর্বে খ্রীষ্টধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। খ্রীষ্টধর্ম মানুষকে শুনিয়েছে মুক্তির আশ্বাস, প্রচার করেছে ঈশ্বরের রাজ্যে মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই, সমতা ও ন্যায়ই মানবধর্ম। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এবং ধর্মীয় ও নৈতিক চিন্তার প্রতি আস্থাই জীবনে স্থায়ী আনন্দ ও সুখের প্রধান কথা।

জাগতিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বাণী প্রচার করে ঈশ্বর ও রাজার যা প্রাপ্য তা নিয়েই উভয়ের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। একের অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ অবাঞ্ছিত, একথাই ঘোষণা করেছে খ্রীষ্টধর্ম।

কালক্রমে যাজক বা পুরোহিত বর্গ একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীতে পরিণত হলে খ্রীষ্টধর্ম ধীরে ধীরে ধর্মীয় সংগঠনে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্রে চার্চের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। খ্রীষ্টধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধর্মীয় ব্যাপারে রাজার আইনগত পরামর্শদাতা হিসাবে রোমের বিশপদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বহু চার্চ ও সংঘারাম (monastery) প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবেই নয়, এইসব চার্চগুলি মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সংস্থা হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে।

কালক্রমে এই চার্চশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের কাজ করে। ধর্মান্তরের সাথে সাথে বহু চার্চ বিশ্ব জুড়ে নির্মান হতে থাকে। বিদেশে বাণিজ্য করার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশ দখল এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এই ছিল সেই সময়কার চার্চগুলির ভূমিকা। বণিকদের সাথে বহু ধর্ম যাজক পাড়ি দিত ধর্মের বাণী শোনানোর জন্য। 'ঈশ্বর এক', খ্রীষ্ট সকল সমস্যার মুক্তিদাতা এই নামে ধর্মান্তর ও সাম্রাজ্য বিস্তার ছিল এই ধর্মের উদ্দেশ্য।

৪। ইসলাম ধর্মের অবদান ঃ .

ইসলাম ধর্মের মূল বিশ্বাস তৌহিদ বা একেশবরবাদ এবং সকল মানুষের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। মানুষে মানুষে সব রকমের বিভেদের

বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নির্দেশ দেয় ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্ম বিশ্বের আধুনিকতম ধর্ম এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সমস্যাবলী খণ্ড খণ্ড করে সমাধান করা সম্ভব নয়, তাই ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নকে ইসলাম ধর্ম একই সঙ্গে গুরুত্ব দেয়।

ইসলামের নবী হজরত মোহম্মদ (দঃ) এর মতে, সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ যে অপরের কল্যাণ কাজে নিয়োজিত থাকে। ইসলাম ধর্মে ক্ষুধার্তকে অন্নদান, আর্ত-পীড়িতকে সেবা এবং অন্যায়ভাবে আটক ব্যক্তিকে মুক্ত করা, প্রতিবেশী বা সাথীকে ভালবাসা ইত্যাদি কাজ প্রতিটি মানুষের করা উচিত বলে নির্দেশিত করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে দানশীলতা ব্যক্তির খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভরশীল নয়। যে কোন সমাজের অভাবগ্রস্তদের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের। জাকাত তাই ধনীর দায়িত্ব এবং গরিবের হক এবং সমাজের অভাবগ্রস্ত লোকদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব।

পয়গম্বর হজরত মহম্মদের কয়েকটি বাণী: জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ কল্যাণ ও মহত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে পারে। যারা জ্ঞানী তারাই উৎকৃষ্ট এবং জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা দয়ালু তারাই সর্বোৎকৃষ্ট।

যে দয়াগুণে বঞ্চিত, সে সর্বপ্রকার মঙ্গল থেকেই বঞ্চিত, দয়াগুণ গ্রহণ কর, কঠোরতা ও অশ্লীলতা ত্যাগ কর। পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি সদয় হও—আকাশের অধিবাসীগণও তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।

যে অপরের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে ঈশ্বর তার প্রয়োজন মেটা'ন। অনাথ বালক বালিকার উপকার করবে। অপব্যয় ও অহংকার না করে খাও, পর ও দান কর।

যে ব্যক্তি আর্তের সেবা করে, সে যেন স্বর্গের পুষ্পচয়ন করে।

মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যে মানুষের কল্যাণ সাধন করে।

ক্ষুধার্তকে অন্নদান করো, রোগীকে সেবা করো এবং নিরপরাধ বন্দীকে মুক্তি দাও। যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করে ঈশ্বর তাকে ইহলোকে ও পরলোকে সাহায্য করবেন এবং যদি সে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাকে সাহায্য না করে, তবে ঈশ্বব তাকে ইহকালে ও পরকালে অপদস্থ করবেন।

দরিদ্রদের ভালবাস, ঈশ্বর তোমার সঙ্গী হবেন। সন্তুষ্টচিত্তে যা দান কবা হয়, তাই হল উত্তম দান। প্রতিটি ভাল কথা ও ভাল ব্যবহারে দান করার সমান পূণ্য হয়। প্রত্যেক সৎ কর্মই দান।

(হাদীস শরীফ থেকে সঙ্কলিত)

অন্যান্য ধর্মের মতনই ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় হয় ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে যখন আরবের পিতৃ-তান্ত্রিক গোষ্ঠী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল এবং শ্রেণী বিভক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার আবির্ভাব শুরু হয়েছিল, এমনি একটা সময় আরবে ইসলামের অভ্যুদয় হয়। খ্রীষ্টধর্ম ইতিমধ্যেই তার প্রগতিশীল ভূমিকার অবসান ঘটিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় পরিণত হয়েছে। মানুষ হতাশ ও বিষাদমগ্ন। মানুষের কাছে মুক্তির কোন আশা নেই এমনই সময় ইসলাম ধর্ম শান্তি, মুক্তি ও আত্মনিবেদনের বাণী নিয়ে হাজির হয়। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মের হতাশগ্রস্ত শাসকশ্রেণী ইসলাম ধর্মকে বিশ্ব ধর্মে পরিণত করল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এই ধর্ম অন্যান্য ধর্মের মতন শাসকশ্রেণীর তল্পীবাহকে পবিণত হয়। তাদের প্রগতিশীল চিন্তার ধীরে ধীরে অবসান হল এবং ধর্ম এক গোড়ামী, মৌলবাদ এবং প্রতিক্রীয়াশীল শক্তিতে পরিণত হল।

তদুপরি ইসলাম ধর্ম মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর কার্যে উৎসাহিত করেছে।

উপরে উল্লিখিত চারটি ধর্মে যেসব বাণী বা উপদেশ আছে তা সবই আধুনিক সমাজ কল্যাণের ভিত্তি। কারণ প্রতিটি ধর্মেই একই কথা সময়োপযোগী ক'রে তুলে ধরা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে প্রত্যেক ধর্মই সেবামূলক কাজকে গুরুত্ব দিয়েছে। সুতরাং বর্তমান সমাজের কল্যাণমূলক কাজের পিছনে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানব হিতৈষী কল্যাণ প্রচেষ্টা যুক্ত আছে। মানব সমাজের শুভ জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের বেঁচে

থাকার সংগ্রাম, সমাজের বিবর্তনের বা বিকাশের কাজে শান্তি, সৌহার্দ্য-প্রেম-প্রীতি, সাহায্য-সহযোগিতার বাণী প্রচারিত হয়ে এসেছে। এই সমাজ বিবর্তনের যুগে মানুষকে লড়াই করতে হয়েছিল কখনও বন্য পশুর সঙ্গে, কখনও অপর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। মানুষের সেই বেঁচে থাকার লড়াই চলছে আজও তাদের পরস্পরের মধ্যেই। অর্থাৎ মানুষের এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সঙ্গে, ধনী দরিদ্রের মধ্যে, শাসক-শাসিতের মধ্যে বিভেদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই আছে। সেই সংঘাতমূলক সময় থেকেই বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকরা হিংসা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে বাণী প্রচার করেছেন। তাছাড়া, তাঁরা একই সঙ্গে জনগণকে সচেতন করিয়েছেন জাগতিক নানা বিষয়ে। স্মরণ করিয়েছেন ভ্রাতৃত্বের কথা, কল্যাণের কথা, সাহায্যের কথা এবং ঈশ্বরের কথাও। বিভিন্ন যুগে ধর্ম প্রচারকগণ শ্রেণী-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-কল্যাণ ও সেবার ক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন। সৃষ্টির সেবাতেই স্রষ্টার সেবা, তুষ্টি....এইসব বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষেরা নানা জনহিতকর কল্যাণ কর্মে আস্থা রেখে চলেছেন।

দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমাজসেবার প্রধান দায়িত্ব পালন করে চলেছেন ধর্মীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ। যে ইংলণ্ডে আধুনিক সমাজ কল্যাণের সূত্রপাত ঘটেছে সেখানেও ধর্মীয় পুরোহিতদের তত্ত্বাবধানে গীর্জার মাধ্যমেই সকল প্রকার দান কাজ পরিচালনা করা হয়। ইংলণ্ডের মতো ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকাতেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সমাজ-সেবার কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

মুসলিম সমাজের ওয়াকফ্, জাকাত, বায়তুল মাল প্রভৃতি প্রথা ও হিন্দু সমাজের দেবোত্তর প্রথা বিভিন্ন রকম দান ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। যে কোন সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাদের এক বৃহৎ অংশ ধর্মীয় নীতি ও প্রেরণার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। বহু বেসরকারী হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়নমূলক বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভাবধারা বা অর্থের অবদান খুঁজে পাওয়া যায়।

ভারতে সমাজ কল্যাণ

ক) প্রাচীন ভারতে সমাজ সেবা ঃ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত প্রাচীন ভারতবর্ষেও ধর্মীয় অনুশাসন ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ভিত্তি করে সমাজসেবা ও সমাজ কল্যাণের কাজ প্রচলিত হয়। প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ প্রথা থাকলেও সমাজ কল্যাণমূলক কার্যকলাপ বন্ধ ছিল না। তখন পরিবার, শিশু, বৃদ্ধ, বিধবা, পংগু, অসুস্থ এবং অন্যান্য নির্ভরশীল মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা হিসাবে কাজ করত। প্রচলিত নীতি অনুযায়ী অবিবাহিত মেয়ে বাবা অথবা বাবার অনুপস্থিতিতে বড় ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণে থাকতো। প্রাচীন ভারতবর্ষে সমাজ কল্যাণ কার্যাবলীর মধ্যে শিক্ষার কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুশাস্ত্রে দানশীলতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-অর্থদান, অভয়দান, বিদ্যাদান। এরমধ্যে বিদ্যাদানকেই তখনকার দিনে সম্মানিত কল্যাণমূলক কাজ বলে বিবেচনা করা হোত। গুরুর বাড়ী থেকে সেবা করে শিক্ষা-গ্রহণ করতে হোত। গুরুরা অনেক সময় শিষ্যদের শিক্ষাদানের জন্য মঠ বা আশ্রম তৈরী করতেন। সেই সময়কার শাসকদের সহায়তায় গুরুরা তক্ষশীলা বারাণসী ও নালন্দার মতন উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম হন। তখন শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল বেদ। বেদ আয়ত্ত করতে বহু সময়ের প্রয়োজন হত। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল বেদাংগ বা উপনিষদ পাঠ। ব্রাহ্মণরা সাধারণত বেদ পাঠেই ব্যস্ত থাকতেন।

প্রাচীন ভারতের শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক। এই ব্যবস্থায় সমাজ কল্যাণ বলতে শাসনকর্তার ব্যক্তিগত দয়া-দাক্ষিণ্যই বোঝাত। প্রজাদের শাসনের মধ্যে রাখার জন্য রাজারা সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাদি নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করতো। যদিও কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' লিখে রেখে গেছেন···প্রজাদের সুখেই রাজার সুখ, তাঁদের কল্যাণই তাঁর কল্যাণ এবং রাজা, বৃদ্ধ, দরিদ্র, অক্ষম, ক্ষতিগ্রস্ত এবং অসহায়দের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে। তবুও সম্রাট অশোকের রাজত্বের

আগে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমাজ কল্যাণ খুবই সীমিত ছিল। সম্রাট অশোকের সেবামূলক কার্যাবলীর মধ্যে রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তার ধারে ফলের গাছ লাগানো পানীয় জলের কূয়ো কাটানো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস মুক্ত হস্তে দানেব জন্য হর্ষবর্ধনের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তার উদবৃত্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করতেন, এমনকি বিতরণের শেষে নিজের রাজকীয় পোশাক ও অলংকার পর্যন্ত বিতরণ করে দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালের রাজারা হর্ষবর্ধনের মতো এতটা সমাজ কল্যাণের কাজ করেন নি। ক্রমশঃ বর্ণভেদ, অত্যাচার-অনাচার বেড়ে চলতে থাকলে সমাজের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে।

খ) মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সমাজসেবা :

মধ্যযুগেব সমাজ কল্যাণ কার্যাবলীর দুইটি বিশিষ্ট ধারা ছিল যথা সরকারী এবং বেসরকারী।

বেসরকারী সমাজসেবা : মধ্যযুগে ভারতে স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ধর্ম প্রচারকরা। মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের বলা হত ফকির ও দরবেশ এবং হিন্দুদের সন্ন্যাসী।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আবার বণিকরা যখন ভারতের উপকূল এলকায়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে আসতে থাকে তখন থেকেই ভারতের সঙ্গে ইসলামের যোগাযোগ শুরু হয়। এই বণিকদের সঙ্গে বহু ফকির এবং দরবেশ এসে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন এবং ধর্ম প্রচারের কাজেও নেমে পড়েন। মুসলিম শাসনের বহু আগেই ইসলাম ধর্মের একটা প্রচারমূলক আবহাওয়া ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বহু দরিদ্র অসহায় মানুষ ক্ষুধা, অনটনের জ্বালায় নিরাপত্তার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। একদিকে ধর্মের আকর্ষণ, সহজ সরলভাবে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক চাপ ভারতের বহু মানুষকে ইসলাম ধর্মে প্রভাবিত করে। অগণিত মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ধর্মপ্রচার করা, লংগরখানা, সরাইখানা নির্মাণ এবং সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, রাস্তা-দীঘি

নির্মাণ, মানুষের বাসের অযোগ্য স্থানকে বাসোপযোগী করে তোলা ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কাজও চলতে থাকে। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর রাজ্য বিস্তারের কাজে শাসকরা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে সমাজসেবা ও ধর্ম প্রচারের কাজে বিঘ্ন ঘটে। ধর্মপ্রচারক ফকির দরবেশদের কেউ কেউ ধনী ও সম্পদশালী ছিলেন। তাঁরাই নিজেদের সম্পত্তি দান করে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। মুসলিম শাসন পূর্বে ও পরে যেমন ধর্মপ্রচারক ভারতে এসেছিলেন তেমন ধর্মপ্রচারের সাথে সমাজসেবামূলক কাজও করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিজামুদ্দীন আউলিয়া, মাহিসওয়ার, সুলতান রুমী, শাহদৌল্লা খাজা মউনুদ্দীন বিমতী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাণ্ডুয়ার জালাহউদ্দীন একটি বিদ্যালয় ও লংগরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। শাহাজানাল সিলেট জেলায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ও সাধারণ মানুষকে স্থানীয় শাসকদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেন। খান জাহান আলী ও তাঁর শিষ্যগণ সুন্দরবনকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করে তোলেন। তিনি রাস্তাঘাট, মসজিদ নির্মাণ ও দীঘি খনন ছাড়াও খোলা পায়ে বাশেদিনের আদর্শে বাগের হাটে একটি ক্ষুদ্র অর্ধ স্বাধীন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। বহু ফকির ও ধর্মপ্রচারকরা এইভাবে নানা জায়গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লংগরখানা, দীঘি খনন, রাস্তাঘাট তৈরী, পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কার্যাদি করে বেড়াতেন। তাঁরা ছিলেন সেইসব মুসলমান শাসকদের দ্বারা প্রভাবিত ধর্মপ্রচারক যারা প্রজাদের নিজ প্রচেষ্টায় সেবা করে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। মুসলিম শাসনকর্তাদের মধ্যে দানশীল এবং মানব হিতৈষী হিসাবে কুতুবুদ্দীন আইবকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বকালে গরীব মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য ইসলাম ধর্মপ্রচারকরা নিজেরাও যেমন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন তেমনিই বহু শিষ্যদেরও অনুপ্রাণিত করেন সেবামূলক কাজে। অন্যান্য ধর্মের ধর্মগুরুরাও সমাজসেবার কাজ করতেন।

হিন্দুরা মুসলমান রাজা দ্বারা অত্যাচারিত প্রজাদের জন্যও লংগরখানা, সরাইখানা, আশ্রম, মঠ ইত্যাদি নির্মাণ করেন।

সরকারী সমাজ সেবা ঃ মধ্যযুগে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজতন্ত্রী এবং সমাজ ব্যবস্থা ছিল প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক। অত্যাচার আর লুঠ করাই ছিল তখনকার শাসকগোষ্ঠীর কাজ। কৃষকদের উপর অত্যাচার করে কর আদায় ছাড়া শাসকরা আর কিছুই জানতো না। বিলাসীতা, বাইজীনাচ, গান, মদ্যপান ইত্যাদির মধ্যেই ডুবেছিল বেশীর ভাগ মুসলমান শাসক। যেটুকু সেবামূলক কাজ করতো হয় তা ধর্মপ্রচারের সাথে সাথে রাজ্য বিস্তারের জন্য আর না হয় নিজেদের অত্যাচার আড়াল করার জন্য। মন ভোলানো সমাজ-সেবা কার্যাবলী করানো হতো ধর্মযাজক সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মাধ্যমে। কোন রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সুসংগঠিতভাবে ছিল না। যদিও মুসলমান রাজারা কিছু কিছু সমাজসেবা করার চেষ্টা করেছেন যা নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। যেমন প্রথম ক্রীতদাস মুসলমান শাসনকর্তা কুতুবুদ্দিন যিনি মুক্ত হস্তে গরীবদের মধ্যে দান করতেন। সম্রাট নাসিরুদ্দীন আলাউদ্দীন, গিয়াসুদ্দীন তুঘলক, ফিরোজ শাহ তুঘলক প্রভৃতিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যাঁরা প্রজাদের জন্য সমাজসেবামূলক কার্যাদি করতেন। এছাড়াও শেরশাহের নাম করা যেতে পারে। যিনি মাত্র পাঁচবছর রাজত্বকালে সমাজ কল্যাণের কার্যাবলী হাতে নেন। যেমন—

ক) ফসলহানির সময় কর মুক্তি।

খ) দরিদ্রের জন্য লংগরে ফুকারা স্থাপন।

গ) সোনারগাঁও থেকে সিন্ধ উপত্যকা পর্যন্ত বিখ্যাত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং পথে ছায়া প্রদানের জন্য বৃক্ষসহ বহু রাস্তা নির্মাণ।

ঘ) পীড়িতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল তৈরী।

ঙ) কৃষক প্রজাদের অধিকার আদায়ের জন্য পাট্টা প্রথা প্রচলন।

চ) অসংখ্য স্কুল ও মাদ্রাসা স্থাপন।

ছ) ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বপ্রকার জনগণের হাতে স্থানীয় শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে পঞ্চায়েত গঠন ইত্যাদি।

গ। ইংরেজ আমলে ভারতে সমাজসেবা :

ইংরেজরা বাণিজ্য করতে এসে ভারতবর্ষে যে বিরাট সম্পদের খনি আবিষ্কার করে তাতে ভারতে তাদের নিজস্ব শাসন বা ক্ষমতা বিস্তারের প্রবণতাও বাড়তে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে ইংরেজ তার শাসন কায়েম করে।

ইংরেজরা যেমন একদিকে অত্যাচার, যুদ্ধ ও কৌশল করে ভারতবর্ষ দখল করেছিল, অন্যদিকে তেমন শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্যেও কৌশলী নীতি অবলম্বন করেছিল। তারা ভারতবর্ষের মানুষের সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করার চেষ্টা যেমন করেছিল তেমনই জনহিতকর কাজ করার বহু চেষ্টাও তারা করছিল। লর্ড বেন্টিকের আমলে শিক্ষার মাধ্যম করা হয় ইংরাজীতে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিবর্তিত হওয়ায় নতুন এক জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং এক বিরাট অংশ কৃষক জমি হারিয়ে দীন-মজুরে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ আমলে স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবাকে উৎসাহিত করা হয় এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ নজর দেওয়া হোত। সমাজকর্ম ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৩৬ সালে বোম্বেতে স্যার মোরারজী টাটা গ্রাজুয়েট স্কুল অফ সোস্যাল সায়েন্স এবং বরোদা ও দিল্লীতে অনুরূপ দুটো সমাজকর্ম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদীয়মাণ সমাজকর্মী বা সমাজসেবক তৈরী করা।

লর্ড বেন্টিক হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা, দেহ সন্তুষ্টির জন্য প্রথম সন্তানকে গঙ্গায় নিক্ষেপ, বিবাহ দেওয়ার অসুবিধায় শিশুকন্যা হত্যা প্রভৃতি কুসংস্কারমূলক কাজ নিষিদ্ধ করে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তিনি গুণ্ডামী, চুরি-ছিনতাইকারী প্রভৃতি দস্যুদলকে কঠোর হাতে দমন করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসীর আমলে হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলন করা হয়। লর্ড ক্যানিং কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে তিনটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। জন লরেন্স বিদ্যালয় স্থাপন রেলপথ ও রাস্তাঘাট তৈরী,

কূপ ও খাল খনন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। লর্ড রিপন ১৮৮৪ সালে Bengal Municipal Act. নামে আইন পাশ করে জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড স্থাপন করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধে সবরকম কাজ এই বোর্ডগুলির ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো। এছাড়াও বহু আইন ও সমাজ কল্যাণমূলক কার্যাবলী ব্রিটিশ সরকার হাতে নেয়। কারণ ব্রিটিশ সরকার ভালোভাবেই জানতো যে, ভারতবর্ষের সম্পদ লুটতে হলে ভারতীয় মানুষকে সমাজসেবা নামক কাজের মাধ্যমে ভুলিয়ে রাখতে হবে। আর তা তারা করেও ছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক, আজ একথা স্বীকার করতেই হবে যে ইংরেজ শাসনকালে ভারতবর্ষে এক নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে। বহু সংস্কারমূলক আন্দোলনও এই সময় গড়ে ওঠে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এই সময় বহু দেশপ্রেমিক, সমাজ সংস্কারক ও সমাজসেবকের সৃষ্টি হয়। তাদের সংস্কারমূলক আন্দোলনের মধ্যে ফরায়েজী আন্দোলন, রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্মণসমাজ, আঞ্জুমানে ইমারেত ইসলাম, ব্রতচারী ও রেডক্রস আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতে সমাজ কল্যাণ ও সংস্কার আন্দোলন

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর একদিকে ছিল শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর গণ-অভ্যুত্থান আবার অন্যদিকে ছিল আন্দোলন বিমুখ সংস্কার এবং কল্যাণমূলক কার্যাবলীর সমন্বয়। যা মূলতঃ শাসকশ্রেণীর দ্বারাই পরিচালিত হত। শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই এই সংস্কারমূলক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হত। যদিও কয়েকটি সংস্কার-মূলক আন্দোলন ছিল সেইকালীন কিছু সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এই সকল আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দ্বারা। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিরা এই আন্দোলনগুলিকে সমাজ সংস্কার বা সমাজ কল্যাণের কাজে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনগুলি কখনই শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছেদ বা জমি থেকে জোতদার, মহাজন, জমিদারদের উচ্ছেদের জন্য পরিচালিত হয়নি। এমনকি বহু জনপ্রিয় সংস্কার আন্দোলনগুলির নেতা বা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী মদতেই আন্দোলনগুলিকে চালাতে পেরেছিল। অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সহায়তাতেই সেকালীন সংস্কারমূলক আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল। এটার মূল কারণ ছিল শাসক শ্রেণীরা বুঝতে পেরেছিল যে রাষ্ট্রকে নিজেদের কব্জায় রাখতে হলে মানুষের আসল চাহিদার আন্দোলনগুলিকে অর্থাৎ রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামগুলিকে বিপথে চালিত করতে হবে। আর এই বিপথে চালিত করার জন্য সংস্কার বা কল্যাণমূলক আন্দোলনই একমাত্র পথ। তবে এই সকল সংস্কার বা কল্যাণমূলক আন্দোলন যে কেবল শাসক-গোষ্ঠীকেই একতরফা মদত দিয়ে এসেছে তা নয়, তা অচেতনভাবে গরীব জনসাধারণকেও সচেতন করেছে এবং মানুষের বেশ কিছু সামাজিক প্রয়োজনও মিটিয়েছে। যেমন পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তা তৈরী, বৃক্ষ রোপণ করা, বিশ্রামাগার তৈরী করা, সংস্কার করা ইত্যাদি।

এমনই কতগুলি সংস্কার বা কল্যাণমূলক আন্দোলনের কথা পর পর আলোচনা করা হলো।....

ফরায়েজী আন্দোলন ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে যখন সামন্তপ্রভু, জমিদার, মহাজন আমলা এবং ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারে কৃষক মজুরের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠছে, দিকে দিকে কৃষক বিদ্রোহের দানা বাঁধছে, সেই সময়ই তথাকথিত সমাজ সংস্কারক বা সমাজ পুনর্গঠনের কর্তাব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছে বেশী। তাদের মধ্যে এমনই একজন হলেন হাজী শরিহতুল্লাহব। তিনি জনগণের কাছে সমাজ সংস্কারের এক নতুন বাণী নিয়ে আসেন এবং তাদের আন্দোলনের সামিল হন। তিনি বিদ্রোহী কৃষক সমাজকে বোঝাতে শুরু করলেন যে তাদের ভাগ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্যাপক সংস্কার সাধনের জন্য ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সাম্রাজ্য-বাদের আদর্শের কথা বলতে লাগলেন এবং আন্দোলনগুলিকে তারই উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করতে লাগলেন।

এই আন্দোলন প্রথমে বাংলার বিভিন্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামের ফরজ বা অবশ্য করণীয় কর্তব্য পালনের জন্য আহ্বান জানানো হতো বলে একে ফরায়েজী আন্দোলন বলা হয়। হাজী শরিহতুল্লাহ এই আন্দোলনের মাধ্যমে কেবল যে সংস্কার বা কল্যাণের কথা বলতেন তা নয় সাথে সাথে তিনি ইসলাম ধর্মেরও প্রচার করতে থাকেন। সব ধর্মাবলম্বী মানুষদের নিয়ে আন্দোলনের কথা তিনি বলতেন না। তাঁর মতে অত্যাচারী শোষকদের হাতে মুসলমান সমাজ পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে এবং এই সবরকম জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। হাজি শরিহতুল্লাহ তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে এই নীতির উপর জোর দেন যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই এবং তাঁর কোন অংশীদারও নেই। অতএব, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দেবদেবী বা পীর দরবেশের পূজা করা অন্যায়, কারণ সেটা ইসলামের একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে।

শিষ্যদের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য হাজী পীর ও মুরিদ উপাধি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেন। কেননা, এই সকল উপাধির প্রচলনে পীরের উপর মুরিদ নির্ভরশীল হয়ে ব্যক্তিত্ব গঠন করে। তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতকে 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করে জুম্মা ও ঈদের নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করেন। প্রথমে শাসক গোষ্ঠী হাজী শরিয়তুল্লাহকে ঘোর বিরোধিতা করে কিন্তু পরে তাঁকে সমর্থন জানায় এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের কাছে তাঁকে এক মহান, বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও মানব-প্রেমিকরূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

হাজী শরিয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মোহম্মদ মদীসীন ওরফে দুদুমিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি আরও নিখুঁতভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং সংগঠনের সুবিধার্থে পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে নেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একজন খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। মুসলমানগণ একে অন্যের ভাই এবং বিপদে একে অপরকে সাহায্য করা উচিত....এই নীতির উপর দুদুমিয়া অত্যাধিক গুরুত্ব দেন। জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে যেসব কর আদায় করতো তিনি তার বিরোধিতা করে বলতেন জমির মালিক জমিদার নয় আল্লাহ স্বয়ং, সুতরাং কর দেওয়া অনুচিত। এই কারণেই সে সময়কার কিছু কিছু জমিদাররা দুদুমিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরায়েজী আন্দোলন জোরদারভাবে চলে কিন্তু দুদুমিয়ার মৃত্যুর পর এই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

আলীগড় আন্দোলন :

ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। কারণ ভারতবর্ষে তখন মুসলিম রাজত্ব ছিল তাই ইংরেজ আসাতে স্বভাবতই মুসলমানদের শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। ইংরেজদের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলতে থাকে। সেই কারণেই

মুসলমানরা ইংরেজদের পরম শত্রু বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলে ইংরেজ সরকার তাদের প্রধান শত্রুরূপে প্রতিষ্ঠা করে। তার ফলে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধার দরজা বন্ধ করে দেয়। সর্বস্তরে মুসলমানরা যাতে পিছিয়ে পড়ে ইংরেজ সরকার তারই এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত করতে শুরু করে।

এমনই সময় স্যার সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান সম্প্রদায়ের সামগ্রিক মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করলেন যা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা ছাড়া বা তাদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া মুসলমানদের পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে তুলে আনা যাবে না। তাই তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য পরিকল্পনা শুরু করেন। ইংরেজী শিক্ষাই এই উদ্ধারের চাবি ভেবে স্যার সৈয়দ আহম্মদ কাজ শুরু করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী হয় আলীগড় কলেজ। পরবর্তীকালে কলেজটি বিখ্যাত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহম্মদ মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স গঠন করেন। মূলতঃ কয়েকটি কারণে এই সকল কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি মুসলমান সমাজে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার বাণী প্রচার করেন। কারণগুলি হ'ল···

১) ব্রিটিশ সরকারের মন থেকে মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করে ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করা।

২) মানসিক অবসাদে ভেঙে পড়া মুসলমানদের উৎসাহ দান।

৩) মুসলমানদের পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত করে তোলা।

৪) শিক্ষা, অর্থ ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মুসলমানদের কমপক্ষে হিন্দুদের সমতুল্য করে তোলাই ছিল আলীগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম

ইংরেজ সরকার ঠিক যে সময় প্রজাদের উপর অত্যাচার তীব্র করেছে, বিশেষ করে মুসলমানদের নানাভাবে বঞ্চিত করেছে সেই সময় আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম নামক সমাজ কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা হয়। মূলতঃ ইংরেজ এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য এই সংস্থা পরিচালিত হয়েছিল যার ভিত্তি ছিল ধর্ম। অর্থাৎ এই সংস্থার সকলরকম প্রেরণা বা উৎসাহের পিছনে ছিল ধর্মীয় বাণী বা প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মওলানা কাজী হামিদউদ্দীন লাহোরে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল ঃ—

১। খ্রীষ্টান মিশনারী ও আর্য সমাজ কর্তৃক ইসলামের বিকৃত প্রচারের মোকাবিলা করা এবং ইসলামকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করা।

২। ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

৩। যুবকদের ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষার বন্দোবস্ত করা।

৪। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিধান করা।

বর্তমান উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছে ঃ

ক) শিক্ষা ঃ ধর্মীয়, পার্থিব ও কারিগরী শিক্ষাদান।

খ) সমাজসেবা ঃ অসহায় নারী, আশ্রয়হীন, অনাথ ও শিশুদের আশ্রয় সংরক্ষণ ও শিক্ষাদান।

গ) সমাজসেবার ক্ষেত্র ঃ ধর্মীয় ও পবিত্র কোরাণ শরীফ প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন।

আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আঞ্জুমানে মফিদুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তা একটি বিশিষ্ট সমাজ কল্যাণ সংস্থারূপে পারচিতি লাভ করে। যার উদ্দেশ্য হল ঃ—

১। মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মিত্রভাব গড়ে তোলা,

২। সদস্যদের অনুপ্রাণিত করা,

৩। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর পর্যালোচনা করা,

৪। সকল শ্রেণীর বিশেষ করে দরিদ্র মুসলিম ছেলেমেয়েদের ধর্মীয়, সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা,

৫। হাসপাতাল ও রাস্তাঘাটের বেওয়ারিশ মৃতদেহের সৎকার করা এবং অসমর্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য করা, এছাড়াও নানান সমাজ কল্যানমূলক কাজে নিযুক্ত হওয়া।

ব্রাহ্ম সমাজ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। গোঁড়া হিন্দু পরিবারের সন্তান হলেও তিনি ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের উপর গভীরভাবে পড়াশুনা করেন এবং হিন্দূ সমাজের প্রচলিত সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। একেশ্বরবাদ ও সামাজিক সাম্যের প্রচার করেন। মূর্তিপূজা, কসংস্কার ও সামাজিক অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাই ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। নারীদের সমান অধিকারের জন্যেও রাজা রামমোহন আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বাল্যবিবাহ রোধ, নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং সতীদাহ, জাতিভেদ ইত্যাদি প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক সংস্কারমূলক আন্দোলন সংগঠন করেন রামমোহন রায় তথা ব্রাহ্ম সমাজ।

আর্য সমাজ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে অর্থাৎ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী দযানন্দ আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম সমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ঠিক তখনই হিন্দু সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য আরও একটি ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করে আর্য সমাজ। স্বামী দয়ানন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরোধিতা করতেন এবং ইংরেজী জানা লোকদের কাছে তাঁর আবেদন রাখতেন না। সাধারণ অশিক্ষিত গরীব জনসাধরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো আর্য সমাজের কাজ। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে আর্য সমাজের মূল পার্থক্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির। ব্রাহ্ম সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন কিন্তু আর্য সমাজ তার বিরোধী ছিলেন। তবুও জাতিভেদ

প্রথা, মূর্তি পূজা এবং বেদের উপর ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিলোপ-সাধনই ছিল আর্য সমাজের লক্ষ্য। নারীদের সমানাধিকার আন্দোলন জোরদার করে আর্য সমাজ। এছাড়াও নানান ধরণের সমাজ কল্যাণ যেমন-দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনহিতকর কার্যাবলীতে আর্য সমাজ আত্মনিয়োগ করে। বিশেষত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আর্য সমাজের দান প্রচুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্য সমাজ ছিল গোঁড়া হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক এক সাম্প্রদায়িক সংস্থা। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারেও আর্য সমাজের ভূমিকা ছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর ভক্তগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করে রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি ধর্ম ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। যা আজ হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র ফাঁকা ধর্মের বুলি দিয়ে জনসাধারণকে যেমন আকর্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, তেমনই কৃষক বিদ্রোহের অশান্তিও দমন করা যাবে না এবং ধর্মের প্রভাবও মানুষের মধ্যে ফেলা যাবে না। তাই তিনি প্রচার করেন 'দরিদ্রজনের সেবার দ্বারাই ভগবানের সেবা করা যায়'—অর্থাৎ মিশনের মাধ্যমে, ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে জনসেবার বৃহত্তম ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে হবে, রামকৃষ্ণ মিশনের দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল :—

১। বেদান্ত দ্বারা প্রচারিত হিন্দু জীবনদর্শনের নীতিকে ভিত্তি করে একদল সাধু সৃষ্টি করা,

২। শিষ্য ও কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করে জনহিতকর কার্যকলাপ পরিচালনা করা।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নানান সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে চলেছে, যেমন-স্কুল, কলেজ, চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতাল, অনাথাশ্রম, বিধবা ও বৃদ্ধদের আশ্রম স্থাপন দুর্ভিক্ষের বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে ত্রাণকার্য ইত্যাদি।

বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এছাড়া, এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজসেবার জগতে রামকৃষ্ণ মিশন একটি ভিন্নতর আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। এই প্রতিষ্ঠান সরকারের নানান সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীগুলিকেও রূপায়ণ করে। শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের দান প্রচুর যদিও সেগুলি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

ব্রতচারী আন্দোলন

বিংশ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ সরকার সমাজের সকল স্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার চালাচ্ছে এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যখন আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে তখনই দেশবাসীর সামাজিক দৈহিক, মানসিক, নৈতিক সাংস্কৃতিক সংকটময় মুহূর্ত দূর কবার জন্য স্যার গুরুসদয় দত্ত আই. সি, এস, ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেন।

সাধারণ অর্থে 'ব্রত' বলতে কোন পবিত্র ও মহৎ কাজে অনুরাগ এবং চারী বলতে কোন কার্যরত ব্যক্তিকে বোঝায়। ব্রতচারীর উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে দৈহিক, মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশে সাহায্য করা।

জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য এবং আনন্দ—এই পাঁচটি নীতির উপর ভিত্তি করে ব্রতচারী আন্দোলন শুরু হয় এবং অল্প দিনের মধ্যে তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রতচারী শিক্ষায় শারীরিক পরিশ্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কারণ তাঁরা মনে করেন যে দৈহিক পরিশ্রম ছাড়া দেহ ও মনের মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় থাকে না। খেলাধুলা, নাচ, গান, প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রতচারী আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশে আজও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ব্রতচারী শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শিশু, কিশোর ও যুবকদের ব্যক্তিগতভাবেও ব্রতচারী আন্দোলনে সামিল হতে দেখা যায়।

সারভেণ্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে গোখ্‌লে (১৮৬৬-১৯১৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'সারভেণ্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। ১৯০৫ সালে এই সংগঠন ভারতীয়দের ভিতর জাতীয়তাবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার কাজ শুরু করেন এবং এমন এক যুবক দল গড়ে তোলেন যারা দেশের সেবার জন্য ব্যক্তিগত সমস্ত আশা-আকাংখা ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ধর্মনিরপেক্ষ এবং দেশের ও সমাজের সমস্যাগুলি এঁরা যুক্তি দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করতেন। এই সমাজের কাজ ছিল নারী উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সমবায় সমিতির মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ এবং ত্রাণকার্যে সাহায্য করা। মূলতঃ শাসক শ্রেণীর একটা অংশ নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ সাধারণ মানুষের উপরে চাপিয়ে দেবার জন্য এবং নিজেদের পছন্দ-অপছন্দগুলিকে সামাজিক সমস্যারূপে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা এবং যুবশক্তির বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে দমন কবার সুকৌশলরূপে তাদের কেবল সামাজিক সংস্কারমূলক কাজে নিয়োগ রাখার এক সূক্ষ্ম আদর্শ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বয়স্কাউট

বর্তমান জগতে বয়স্কাউট একটি পরিচিত নাম বা তথাকথিত যুবকল্যাণমূলক আন্দোলন। এই আন্দোলনের জন্ম সর্বপ্রথম ইউরোপে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সংবাদ আনয়নের অর্থাৎ গুপ্তচর বৃত্তির কাজে ব্যবহার কবা হয়েছিল। সেই কারণেই তাদের স্কাউট বলা হত। ভারতবর্ষে যখন ইংরেজরাজ কায়েম ছিল সেই সময় থেকেই পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন এই সংস্থাটি ভারতে প্রবেশ করে কয়েকটি ইউরোপীয়ান ব্যক্তিসহ। স্যার রবার্ট ব্যাডেন পাউয়েল বয়স্কাউট আন্দোলনকে বর্তমান রূপদান করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অবিভক্ত বাংলায় বয়স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানি বেসাণ্ট ভারতীয় স্কাউট এ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন; ঠিক এইভাবেই অথচ অন্য নামে মেয়েদের মধ্যে আর একটি বিশেষ সংস্থা

কাজ করে যার নাম গার্লস গাইডস্ এ্যাসোসিয়েশন। এই আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন লেডী ব্যাডেন পাউয়েল।

এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল জাতি ও বর্ণের পার্থক্য সৃষ্টি না করে সকল মানুষের সেবা করা। যুব কল্যাণ আন্দোলন হিসাবে বিভিন্ন সুশৃংখল সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সদস্যদের চরিত্র গঠনের উপর জোর দেওয়া হত। দেশ, সরকার এবং স্কাউট আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং স্বীকার করে সকল সময় মানুষের সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক স্কাউটকে শপথ নিতে হয়। আহতদের সেবা করার জন্য স্কাউটদের প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) শেখানো হয়। অর্থাৎ যুবশক্তি যাতে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী ও শাসকশ্রেণী বিরোধ বিপ্লবী আন্দোলনে সহযোগ না দিতে পারে তারজন্য যুবশক্তিকে সামাজিক কাজের নামে, চরিত্র গঠনের নামে ইংরেজ ও শাসক শ্রেণীর তাঁবেদার ও পদলেহী যুবকরূপে সৃষ্টি করতে চায় প্রত্যেক স্কাউটকে। প্রয়োজনে প্রত্যেক স্কাউট যাতে গুপ্তচর বৃত্তি করতে পারে সেই সেই দেশ ও সরকারের পক্ষে সেই শপথই নিতে হয় প্রত্যেক স্কাউটকে। এই স্কাউট আন্দোলন এখন প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। পশ্চিমী দুনিয়ার বহু দেশে এখনও নিয়ম আছে উচ্চ বিদ্যালয় শেষ করার পর অন্তত এক বছর দেশ সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ মিলিটারীতে যোগ দিতে হবে। বিকল্প হিসাবে রয়েছে সমাজসেবা বা কোন মিশনারী প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছায় সমাজ কল্যাণ কাজে নিয়োজিত হতে হবে কিংবা চিকিৎসা বিভাগের যে কোন একটি বেছে তৃতীয় দুনিয়ার গরীবদের মধ্যে সেবাকার্য করতে হবে কিংবা স্কাউটের হয়ে যুদ্ধরত দেশগুলিতে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা ইত্যাদি-অর্থাৎ একপ্রকার বাধ্যতামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছে যুবশক্তিকে পশ্চিমী দেশগুলির সরকার।

রেডক্রস আন্দোলন

বিশ্বে রেডক্রস একটি সুপরিচিত নাম। ১৮৬৩ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে একটি বিশেষ সম্মেলনের মাধ্যমে

রেডক্রস সংস্থার জন্ম হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূলে ছিলেন হেনরী ডুন্যান্ট। বর্তমান রেডক্রস সোসাইটি জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ বহু সমাজ কল্যাণ সংস্থার মধ্যে একটি।

ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে ইটালিয়ান ও অষ্ট্রীয়ান সৈন্যদের এক প্রবল সংঘর্ষের ফলে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে রূপায়িত হয়। পনেরো ঘণ্টা এই যুদ্ধের ফলে নিহত ও আহতদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি ৪০,০০০ জন। আহত এই সৈনিকদের দিকে তাকানোর বা তাদের চিকিৎসা এবং সেবা করার মতন কেউই ছিল না। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ডুন্যান্ট গভীরভাবে অভিভূত হয়ে আশপাশের গ্রামের লোকেদের সংগঠিত করে একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তুলে আহতদের সেবা ও পরিচর্যা শুরু করলে বহু সৈনিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

মানব কল্যাণে ব্রত ডুন্যান্ট ১৮৬৩ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে এক সম্মেলনের আহ্বাণ করলে ১৪ জন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ উপস্থিত হন। এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল এমন একটি স্থায়ী সংগঠন সৃষ্টি করা যারা (ক) যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবার কাজ করবে নিরপেক্ষভাবে। অবশ্য প্রথম পর্যায়ে রেডক্রসের প্রধান লক্ষ্য ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যু-পথযাত্রী আহত সৈনিকের সেবা করা কিন্তু পরবর্তীকালে এর কার্যক্রমের পরিধি আরও বিস্তারিত করা হয়। নিছক যুদ্ধক্ষেত্রে সেবাকার্য ছাড়াও এখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অস্বাস্থ্য, পুষ্টিহীনতা প্রভৃতির মোকাবিলার ক্ষেত্রে রেডক্রসের কাজ বিস্তার লাভ করে।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে 'লীগ অব রেডক্রস সোসাইটি' গঠিত হয়। এই সোসাইটির মাধ্যমে দুর্গত মানবতার সঙ্গে বিশ্বের সমাজ হিতৈষী শক্তিসমূহের সাক্ষাৎ যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রেডক্রস সোসাইটিকে সেবা প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে প্রায় দেড়শোরও অধিক রাষ্ট্রে রেডক্রস সোসাইটির শাখা বিস্তৃত রয়েছে।

বর্তমানে রেডক্রস আন্দোলন প্রধানত দুইটি সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করছে; একটি আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি, অপরটি লীগ অব দি রেডক্রস সোসাইটি। প্রথমটি, রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে। এর আওতার মধ্যে পড়ে যুদ্ধ-কলহ থেকে সৃষ্টি সমস্যাগুলি। যেমন যুদ্ধবন্দী এবং যুদ্ধোত্তর অন্যান্য সমস্যার সমাধান। দ্বিতীয়টি, দেখাশোনা করে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ কর্মসূচী, যেমন—যুদ্ধকালীন রিলিফ কাজ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে রিলিফ কাজ, নার্সিং পেশা উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

মূলতঃ রেডক্রস সোসাইটি একটি আন্তর্জাতিক রিলিফ সংস্থা যারা মানব সমাজের মৌলিক সমস্যার সমাধানের কোন উপায় বাতলায় না বরং রিলিফ দিয়ে তাদের মৌল সমস্যার আড়াল করে। বিভিন্ন রাষ্ট্র শাসক সৃষ্টি সমস্যার সমাধানের জন্য কোন প্রতিরোধ করে না। যুদ্ধের কারণগুলির অবসান ঘটায় না। যুদ্ধ-বিরোধী বা নিরস্ত্রীকরণের কোন চেষ্টা না করে কেবল মানবতার দোহাই দিয়ে রিলিফ কাজ পরিচালনার একটি শ্রেষ্ঠ সংস্থারূপে রেডক্রস প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দেশী-বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানদের কর্তৃক।

ভারতে ভক্তি আন্দোলন!

ভারতে 'ভক্তি' আন্দোলন কবে এবং কোথায় শুরু হয় সেই বিষয়ে প্রামানিক ঐতিহাসিক তথ্য সামান্যই পাওয়া যায় এবং যা পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয়। তবু ঐতিহাসিকগণ মনে করেন 'ভক্তি' আন্দোলন সূচনা হয় পল্লব রাজাদের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে তামিলভাষী জনগণের মধ্যে। চতুর্থ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে কিছু তামিল ঈশ্বর সাধক বিষ্ণু এবং শিবের উদ্দেশ্যে গীত রচনা করেন।

সেই সময় হিন্দু মন্দিরের নির্মাণও ব্যাপক দেখা যায় এবং যে সকল তামিলগীত শিবের ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্য রচনা করা হয় তা তামিল সংস্কৃতির বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ধীরে ধীরে এই ভক্তি গীতিগুলি বিকাশ লাভ করে কানাড়ভাষী ও মারাঠীভাষী অঞ্চলে এবং তার পর হিন্দীভাষী উত্তর ভারতে ব্যাপক আকারে এই ভক্তি আন্দোলন বিস্তার লাভ করে।[২]

মধ্যযুগে যখন ধর্মে হানাহানি, হিন্দু মুসলমানে বিভেদ, চরম ধর্মীয় কুসংস্কার ও কঠোর জাতিভেদ প্রথা দেখা দিল এবং ধর্মীয় পণ্ডিতগণ প্রচার করলেন – নীচু জাতের লোকেরা মন্দিরে গেলে মন্দির অপবিত্র হবে, মুসলমানের ছোঁয়া খেলে জাত যাবে ঠিক সেই সময়ে রামানন্দ, নামদেব, কবীর, শ্রীচৈতন্য, নানক ও দাদু প্রমুখ ধর্ম প্রচারকেরা হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় নিয়ে এক অভেদ ধর্ম প্রচারের জন্য ভক্তি আন্দোলন শুরু করেন। ভগবানে ভক্তি ও অহিংসা এবং সৎ জীবন-যাপন করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য।

এদের মধ্যে নামদেব ছিলেন নীচু জাতের ছেলে। কবীর ছিলেন মুসলমান, শ্রীচৈতন্য ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে, আর নানক জন্মেছিলেন বণিকের ঘরে। দাদু ছিলেন ধুনকর বংশজাত।

রামানন্দ হিন্দু মুসলমান, নারী পুরুষ, ধনী গরীব সকলকেই ধর্মসাধনার অধিকার দিয়েছিলেন। নামদেব ও নানকের হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই শিষ্য ছিল। এদিকে চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন যবন হরিদাস। এঁদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বিরোধ দূর করে মিলন ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা। তাই কবীর বলেছেন ঃ "পুরির দিশা হরীকা বাসা পশ্চিম অলহ মুকামা। ছিল হী খোজি দিলে দিল ভীতরি ইহা রাম রহিমানা"। রামানন্দের বিখ্যাত শিষ্য কবীর গোঁড়া হিন্দু-মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর কঠোর আঘাত হেনেছিলেন। তাঁর মতে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করে পবিত্রভাবে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের নাম জপ করলেই মুক্তিলাভ করা যায়। তিনি হিন্দু-মুসলমান ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী ছিলেন না। কবীর তাঁর দোঁহা ও ভজনের মধ্যে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী প্রচার করেন। তিনি বলতেন হিন্দু ও তুরকগণ একই মাটির দুটি পাত্র। তিনি হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মূলনীতিগুলো প্রচার করে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অভেদ সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াস করেছিলেন। কবীর এই দুই ধর্মের অর্থহীন আচার আচরণের তীব্র নিন্দা করতেন। তিনি বলতেন ভগবান বা আল্লাহ মন্দিরেও নেই, মসজিদেও নেই। কৈলাসেও তাঁকে খুঁজে

পাওয়া যাবে না, কাবাযও নয়—মানুষের মনের মধ্যেই ভগবান বা আল্লাহ্ বাস করছেন। কবীর বলতেন সাধুলোকের হিন্দু ও মুসলমান বলে কোনো ধর্ম বা জাত নেই। সাধু সাধুই।[৩]

ভারতের তদানীন্তন সামান্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের শোষণ ও নিপীড়ন কেবলমাত্র রাষ্ট্রযন্ত্র, প্রশাসক ও ভূস্বামীদের পক্ষ থেকেই পরিচালিত হতো না, মোল্লাতন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিততন্ত্র ও সাধারণ মানুষের উপর শোষণ-নিপীড়নের একটি উৎস হিসাবে কাজ করত। তাই দেখা যায় 'ভক্তি' আন্দোলনের মাধ্য দিয়ে সামাজিক অবিচার, জাতিভেদ ও নিপীড়নের যে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় তার নায়ক—নায়িকারা সকলেই ছিলেন সমাজের খেটে-খাওয়া স্তরের মানুষ।[৪]

পঞ্চদশ শতকে মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুর শহরটি 'ভক্তিবাদ' আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ঐ শহরে এক হিন্দু দর্জির পুত্র নামদেব জাতি-ভেদ প্রথার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ষোড়শ শতকের সূচনায় 'সৎপন্থ' (বা সঠিক পথ) নামে এক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। এই সম্প্রদাযের ভক্তরা ঐশ্বর্য্য বিলাসের নিন্দা করতেন এবং প্রচার করতেন পরিশ্রম ও সততার মূল্য। গুজরাট, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে এই সম্প্রদায়টি ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে।[৫]

উত্তর ভারতের মীরাবাঈ-এর সঙ্গীত আজও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি একজন রাজপুতের স্ত্রী হয়ে সমাজের সমস্ত নিয়ম নীতি অমান্য করে সাধু-সন্তদের সাথে মেলামেশা করতেন বলে সমাজচ্যুত হন। কিন্তু তিনি যে গান রচনা করেছেন তাতে মানুষকে পরিবার ও জাতের স্বাভাবিক নিয়ম কানুন মেনে চলবার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য কৃষ্ণ ভজনে বা কৃষ্ণের প্রেমে ও তাঁর সঙ্গে যৌন মিলনে সমস্ত ব্যথা বেদনার অবসান হয়।

একইরূপভাবে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য ভক্তিবাদের আর একটি ধারা সৃষ্টি করেন। তিনি কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব মতকে একত্রিত করে নতুন এক ধর্মমত প্রচার করেন। জাত পাত নির্বিশেষে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত যে

কোন মানুষকে এবং এমনকি মুসলমানদেরও শিষ্য করলেন। তিনিও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কথা শোনালেন। ভক্তি আন্দোলন এই সময় সাধারণ মানুষের দুঃখের কথা প্রতিবাদী ভাষায় জানিয়েছে জাত ধর্ম নির্বিশেষে। সামন্তযুগে এই আন্দোলনের চরিত্র কিছুটা স্বতন্ত্র ও প্রতিবাদী হলেও মূলত ধর্মের গোঁড়ামী তাদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে নি। তাঁরা যেমন উদার ছিলেন সকল জাত ও শ্রেণী সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অন্যদিকে তাঁরাও ধীরে ধীরে সংকীর্ণমনা হয়ে পড়েন গুরুর প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে নানা ধরণের ধর্মীয় ও জাতকে একত্রিত করলেও শ্রেণী সংগ্রামের দিকে সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে সংগঠিত করতে পারেনি। কিংবা তদানিন্তন সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত আন্দোলনের রূপও দিতে পারে নি 'ভক্তি' আন্দোলন।

এই আন্দোলন যেমন সমাজের নিপীড়িত অংশের মানুষের মধ্যে জোয়ার এনেছিল তেমনি আবার বিচ্ছিন্ন হতেও সময় লাগেনি কারণ একক প্রচেষ্টা ছিল ভক্তি আন্দোলনের মূল সংগঠন এবং কৃষ্ণ বা প্রেমই ছিল আদর্শ। ফলে এই আন্দোলনের জোয়ার খুবই তাড়াতাড়ি সামন্ত শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষ পুনরায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এ জাতিও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন সারা ভারতব্যাপী মধ্যযুগে দেখা দিলেও, তা ছিল বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত এবং সময়ের ব্যবধান। যার মৃত্যু সহজেই ঘটেছিল রক্ষণশীল ও ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের মাধ্যমে।

সূত্র ঃ—

১। ভারতের সভ্যতা সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ, সুকোমল সেন, পৃঃ ১৬৪

২। ঐ

৩। আন্তর্জাতিক ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতা ৬ঃ কালীপদ মালাকার, পৃঃ ২২৭—২৩১

৪। ঐ পৃঃ ১৬৫

৪। ঐ পৃঃ ১৬৬

মধ্যযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতি

ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অতীতভিত্তিক ও প্রগতিবিমুখ ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিভিন্ন রকম ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম ছিল কিন্তু ধর্ম বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়ে নানান ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল ছিল। ধর্মের সঙ্গে আঞ্চলিক, ভাষা, সম্প্রদায় ও বর্ণভেদও জনজীবনে সক্রিয় ছিল। দেশের মোট জনসংখ্যায় মাত্র ক্ষুদ্র অংশ ছিল উচ্চতর শ্রেণী বা অভিজাত সম্প্রদায়। যাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চাইতে ভিন্ন ছিল।

হিন্দুদের সামাজিক জীবনে বর্ণ বা জাত ছিল সবচেয়ে বড় ব্যাপার। হিন্দুদের ছিল চার বর্ণ, আবার এই চার বর্ণের মধ্যে অনেক রকমের 'জাত' (জাতি) ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতের মধ্যে আচার, আচরণ, প্রকৃতি প্রভৃতি ছিল বিভিন্ন রকম। উচ্চতর বর্ণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান ছিল শীর্ষে। সবকিছু সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ভোগী এরাই। এরা বেশীরভাগ সময় নিজ অঞ্চলে প্রতিভাশীল ও ক্ষমতাবান অন্যদিকে অর্থবানও ছিল। উচ্চ বর্ণের সম্প্রদায়রা জাতি-ভেদাভেদ করতেন খুব বেশী। এমনকি এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। নিজেদের জাতের মধ্যে বন্ধন ছিল নিবিড়। উচ্চ বর্ণের মানুষেরা নিম্ন বর্ণের ছোঁয়া খাদ্য এমনকি পানীয় জল পর্যন্ত স্পর্শ করত না। এই জাত-পাতের ভেদাভেদের মধ্যেই শুরু হয়েছিল পেশা। সাধারণ উচ্চজাতের মানুষেরা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করত। নিম্ন বর্ণের মানুষেরা শ্রমজীবি কাজের সঙ্গে যুক্ত হতেন। অর্থাৎ সমাজে উৎপাদনের সমস্ত প্রণালীগুলি পূরণ করত নিম্ন বর্ণের মানুষেরা। এছাড়াও নিম্ন ধরনের সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চ বর্ণের মানুষদের সেবা করতেন। চাকুরী করা শিক্ষা অর্জন করা, উচ্চ সম্প্রদায়ের সমতুল্য হবার চেষ্টা করা, বা নির্ধারিত সামাজিক দায়িত্ব পালন না করলে উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছ থেকে শাস্তি পেতে

হত। বা জাতিচ্যুত হতে হয় এমনকি উচ্চবর্ণের কেউ যদি নিম্ন বর্ণের মানুষদের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক বা সামাজিক বিনিময় করে তাহলেও তাকে সেই বর্ণ থেকে বহিষ্কার বা সামাজিক বয়কট করা হত। হিন্দুদের মধ্যে এই জাতি ভেদাভেদ থাকার ফলে ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে বাধা ছিল অনেক। অষ্টাদশবর্ষের ভারতবর্ষে প্রতি গ্রামের মধ্যেই ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে গোটা ভারতবর্ষ জুড়েই এই জাতি, ভেদা-ভেদ থাকার ফলে সেই সময় ব্রিটিশ ভারতকে খুব সহজেই কব্জা করতে পেরেছিল। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনগুলিও অনেক সময় সংগঠিত রূপ নিতে পারেনি জাতি ভেদাভেদের কারণে।

অর্থনৈতিকগতভাবে শক্তিশালী হিন্দুরাই ছিল উচ্চবর্ণের ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, বিলাসিতা, শাসন ক্ষমতা স্থানীয় বা রাজ্য স্তরের অধিকারী। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগী এই ব্যক্তিরা অন্যদিকে যেমন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালাত তেমন আবার ইংরেজ সরকাবের তাঁবেদার গোষ্ঠীরূপেও কাজ করত। নিজস্ব ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিগুলিকে বর্জন করে ইংরাজী মনোভাব পোষণ কবত। বিদেশী আদবকায়দা অনুসরণ করার চেষ্টা করত। এবং ভারতবর্ষের গোটা সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করত। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের মতন নানান ধর্ম না থাকলেও তাদের মধ্যে প্রায়ই সিয়া ও সুন্নী অভিজাতদের মধ্যে ধর্মমত নিয়ে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমানদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি বেশ ক্রিয়াশীল ছিল। বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায় ভেদবুদ্ধির সঙ্গে সামাজিক বা আর্থিক অবস্থার তারতম্য বিচার ছিল। মুসলমান অভিজাত ও উচ্চপদস্থগণের মধ্যে ইরাণ, তুরাণী, আফগাণী বা হিন্দুস্থানী বংশ-গৌরব নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবোধ, সংকীর্ণতাবোধ ইত্যাদি ছিল স্ব-স্ব উচুঘরের গৌরবে অপরকে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত ছিল। উচ্চ-সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা ওমরাহ, বাদশাহ, সুলতান ইত্যাদি বংশের গৌরবে অন্য মুসলমানদের তারা হীন চোখে দেখত। যদিও ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের কোন স্থান নেই। মুসলমান

সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল দুটি শ্রেণী। অভিজাত সম্প্রদায়, মৌলভী ও মোল্লা এবং সেনাধ্যক্ষ বা উচ্চ রাজকর্মচারীগণ 'শরীফ' শ্রেণী বলে গণ্য হত। এই শরীফ শ্রেণী আজলাফ বা নীচু জাতের মুসলমান বলে অন্যদের অবজ্ঞা করত। বহু হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েও উচ্চজাত বংশের অভিমান মনে মনে পোষণ করত, এবং নীচুবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সামাজিক ভাবে এড়িয়ে চলত। অবশ্য হিন্দু থাকাকালীন যে ধরণের তীব্র মনোভাব ছিল নিম্ন বর্ণের প্রতি, মুসলমান হবার পর অনেকটা নরম হতে দেখা দিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জাতি ভেদাভেদ থাকলেও বড় ধরণের সামাজিক কলহ বা দ্বন্দ্ব কখনও হয়নি। এই বিভেদের মধ্যেও দেখা গেছে সাম্প্রদায়িক প্রীতি। পরিবারগুলির মধ্যে একতাবোধ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীর স্বাধীনতা বলতে তেমন কিছু ছিল না। ভারতে পরিবার প্রথা সাধারণতঃ পিতৃকেন্দ্রিক বা পুরুষ শাষিত পরিবার অর্থাৎ উত্তরাধিকার পুরুষ সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কেবলমাত্র কেরলে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা চালু ছিল। এর বাইরে স্ত্রীদের পুরুষ নির্ভর হয়ে থাকতে হত। স্ত্রী জাতি ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে জীবন-যাপন করত। যদিও নারীদের জননীরূপে শ্রদ্ধা বা তাদের প্রতি সম্মান দেখান হত। এমন কি যুদ্ধ বা অরাজকতার সময়েও নারী প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান দেখানো হত। নারীদের প্রতি লাঞ্ছনা বা অপমানের ঘটনা খুবই বিরল সাধারণের মধ্যে। যদিও রাজা, মহারাজা বা বাদশাগণ নারীদের ভোগ্যপণ্যরূপে একাধিকবার ব্যবহার করতেন। 'হারেম' বা 'রক্ষিতা' রূপে নারীদের ভোগ করা হত সাধারণত উচ্চবর্ণের বা শ্রেণীর দ্বারা। তবে আধুনিক সমাজের মতন নারীদের একাকিনী যে কোন স্থানে চলাফেরা করতে বা জনবহুল স্থানের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করার সময় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করার এমন লোকেদের রাস্তায় চলতে মেয়েদের দিকে খারাপ দৃষ্টি দেওয়া বা হাসি মস্করা বা, ভয় দেখানো, কিংবা অশ্লীল আচরণ ইত্যাদির ভয় ছিল না। এই সময় নারীরা যেমন ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল অন্যদিকে সম্মান ও মর্যাদা

লাভ করে পরিবার পরিচালনা থেকে শুরু করে রাজ্য পরিচালনা পর্যন্তও করতে দেখা গেছে। যদিও বেশির ভাগ নারীই ছিল উচ্চবর্ণের বা অভিজাত শ্রেণীর। উচ্চবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জ্ঞান অর্জন করতে ঘরের বাইরেও ছাড়া হত। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়গণের নারীরা জীবিকা অর্জনের জন্য বাইরে নানারকম কাজ কর্মে যোগ দিত। গরীব শ্রেণীর রমনীদের সামাজিক বাধা থাকা সত্ত্বেও অভাব দূর করার জন্য বাইরে এমনকি কৃষিকাজেও যোগ দিতে হত। পর্দাপ্রথা সাধারণত উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বিশেষ করে উত্তর ভারতে। দক্ষিণ ভারতে পর্দাপ্রথার প্রচলন খুব একটা ছিল না।

ছেলে মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা বা আদানপ্রদান একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। পরিবারের কর্তা ব্যক্তিগণই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করতেন এবং বাল্যকালেই বিবাহ কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। একাধিক বিবাহ পুরুষদের জন্য স্বীকৃতি ছিল। যদিও বহু বিবাহ কেবলমাত্র ধনী পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ ভারতে এক স্ত্রী বিবাহ প্রথাই তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল। অপর দিকে মেয়েদের একবার বিবাহই সমাজ সম্মত ছিল। পণ প্রথার প্রচলন সে সময়ও ছিল তবে কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মধ্যে। বিবাহের সময় প্রচুর অর্থব্যয় করতে বিশেষভাবে বাংলা ও রাজপুতনায় ব্যাপকভাবে দেখা যেত। মহারাষ্ট্রে পেশোয়াগণের বিশেষ চেষ্টায় এই প্রচেষ্টা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে আরও কয়েকটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কু-প্রথা প্রবলভাবে কাজ করত। একদিকে সতীদাহ প্রথা অন্যদিকে বৈধব্য প্রথা। সতীদাহ প্রথার অর্থ ছিল মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রীর জীবন্ত অবস্থায় সহমরণ। রাজপুতানা, বাংলা এবং উত্তর ভারতের কিছু কিছু অংশে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। দক্ষিণ ভারতে এর বিশেষ প্রচলন ছিল না। অনেকাংশে সতীদাহ প্রথা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। বিশেষ করে রাজা, বড় জমিদার বা প্রভাবিত ব্যক্তির

মধ্যেই। এছাড়াও তাদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি সকলগণই এই প্রথার ব্যবহার করতেন। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ সমাজ সম্মত ছিল না। যদিও কয়েকটি অংশে বিধবা-বিবাহ সমাজ সম্মত ছিল। মহারাষ্ট্রের অব্রাহ্মণদের মধ্যে, জাঠ এবং উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের মধ্যে বিধবার পুনঃ বিবাহ বেশ প্রচলিত ছিল। বিধবাদের কষ্টের সীমা ছিল না। একদিকে তাদের যেমন খাদ্য, পোশাক, চলাফেরা সবই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত অন্যদিকে সমাজ চাইত যে একজন বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর পার্থিব সুখভোগ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে তার স্বামীর পরিবার অথবা তার ভ্রাতার পরিবারের নিঃস্বার্থ সেবায় জীবন অতিবাহিত করবে অর্থাৎ স্বামীর পরিবার কিংবা তার ভ্রাতার পরিবারে দাসীর মতন আজীবন তাদের মন জুগিয়ে সেবা করবে। এই সকল প্রথা একদিকে যেমন গোটা সমাজের অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিয়েছিল অন্যদিকে তেমন বহু সহৃদয় ব্যক্তি প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন। অনেকাংশে তারা কৃতকার্য্য না হলেও গোটা সমাজে রেখাপাত করেন এবং সংস্কার আন্দোলনগুলিকে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেন।

এই সময়ে ভারতবর্ষে অধিকাংশ শ্রেণীর মানুষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। এক ঘেয়েমী গতানুগতিক জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নানান ধরণের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়োছল। একদিকে রাজা-রাজাদের মধ্যে যুদ্ধ, অন্যদিকে মোঘলদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল। প্রাচীন ভারতে সমাজ উন্নয়নের বা পরিবর্তনের বিরাট ঝোঁক ছিল। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ছিল বর্বরতা, অত্যাচার আর দারিদ্রতার সাথে সাথে সামাজিক অবক্ষয় পশ্চাৎগমন, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আর বিশৃঙ্খল জীবন।

সাংস্কৃতিক মান বৃদ্ধির পিছনে ছিল অভিজাত বা উচ্চ শ্রেণীর অর্থদান। সাধারণভাবে রাজদরবার, শাসককূল বা স্থানীয় ভাবে প্রভাবশীল ব্যক্তিদের উদ্যোগেই চলত সাংস্কৃতিক ধারা। এই সকল শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার অবনতির সাথে সাথে শিল্প, সাহিত্য, কলা

ইত্যাদির ভাঙ্গন ধরে। মুঘল সমাজের ভাঙ্গনের ফলে বহু চিত্রশিল্পী স্থানান্তর হয়ে অর্ধস্বাধীন বা স্বাধীন রাজ্যে আশ্রয় নেয়। সে ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে শিল্পকলার বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। এই সময় সঙ্গীত কলারও কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছিল।

কাব্য ও সাহিত্যের রচনাগুলি ছিল প্রাণহীন। জীবনের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলত। কিছু কিছু অঞ্চলে আঞ্চলিক কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে জীবনের সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজের অবক্ষয়ের কারণে সাহিত্য কাব্য ইত্যাদি গতানুগতিক হয়ে পড়ে। তখনকার দিনে জনমানসে যে হতাশা ও সন্দিগ্ধতার উদ্ভব হয়েছিল নৈরাশ্যবাচক এই রচনাগুলিতে সেই ভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছিল। কাব্যগুলি যে সকল রাজা-উজীর অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল সেগুলি ছিল অত্যাধিক নিম্নগামীর। কিন্তু এই সময় উত্তর ভারতে উর্দু ভাষার প্রসার এবং উর্দু কাব্য সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ঘটেছিল। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য উর্দু ভাষা একটি মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উর্দু সাহিত্যের দুর্বলতা থাকলেও মীর, সৌদা, নাজির প্রভৃতি শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন মীর্জা গালিব। উর্দু সাহিত্যের মতই মালয়ালম, তামিল, সিন্ধি, আসাম, গুজরাট, পাঞ্জাব ইত্যাদি কাব্য সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। মালয়ালম সাহিত্যের বিকাশ মার্তণ্ডবর্মা প্রভৃতি ত্রিবাঙ্কুর নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই সম্ভব হয়েছিল।

কেরলের কথাকলি সাহিত্য, অভিনয় ও নৃত্য সামরিকরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। তামিল সাহিত্যের 'সিত্তার' কাব্য ধারার অন্যতম স্মরণীয় পথিকৃৎ ছিলেন তারাউমানাবর (১৭০৬-৪৪)। অন্যান্য 'সিত্তার' ধারার কবিদের মতই ইনি জাতিভেদ প্রথা এবং জনসাধারণের দেব-মন্দিরের দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন তার রচিত কাব্যের ভাষায়। আসাম রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আসাম সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। গুজরাটের শ্রেষ্ঠ কবি দয়ারামের আবির্ভাব এবং পাঞ্জাবের 'হীর-রন্ধা' নামে বিখ্যাত রোমান্টিক মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। এছাড়া

সিন্ধী ভাষার সাহিত্যের উন্নতি দেখা যায়। এই সকল সাহিত্যের বিকাশ বিচ্ছিন্নভাবেই দেখা দিয়েছিল কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা এই সকল সাহিত্য বা কলার রচনায় স্থান বিশেষ পায়নি। গণশিক্ষার বিকাশ না ঘটার ফলে সাহিত্য সংস্কৃতি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে গণশিক্ষার প্রসারের জন্য এই সকল উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা কোন প্রচেষ্টাই চালাননি ফলে সাহিত্য সংস্কৃতি বিশেষ শ্রেণীর ধারক ও বাহকরূপে পরিণত হয়েছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে দেখি, যেখানে সে গিয়েছে সেখানে স্থানীয় পুরাতন সভ্যতাকে ধ্বংস ও নির্মূল না করে সে তৃপ্ত হয় নি। এই ধ্বংসের ব্যাপারে যে শুধু সংস্কৃতিতে অনগ্রসর অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডে ঘটেছে, তা নয়; আমেরিকার সুসভ্য 'মায়া' ও 'আজতেগ' সভ্যতারও উচ্ছেদ না করে সে নিবৃত্ত হয় নি। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস অন্য রকমের। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় আর্যদের আসবার পূর্বে আর্যপূর্ব দ্রাবিড় সভ্যতাকে আর্যরা নষ্ট করেন নি দ্রাবিড়েরাও তৎপূর্ব সব সভ্যতার উচ্ছেদ সাধন করেন নি। ভারতের গ্রাম্য পঞ্চায়েত সভাসমিতির দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি প্রথাও বোধ হয় আর্যদের পূর্বেই ছিল। লিচ্ছবি বৃজি বৈশালীতে এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে লোকেরা নির্বাচন প্রথায় ভোট দিয়ে শাসনকার্য চালাতেন। মুসলমান রাজারাও এই পঞ্চায়েত শাসন নষ্ট করেন নি। রাজার অদলবদল হলেও গ্রাম্য ব্যবস্থা ঠিকই থাকত। এই পঞ্চায়েত প্রথা ইংরেজ আমলে নষ্ট হয়েছে।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবাসীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করাই ছিল ভারতে অনুসৃত ব্রিটিশ নীতি। কিন্তু ঠিক এর পরবর্ত্তী মুহুর্তেই ব্রিটিশ শাসককুল ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে শিল্পপতি ধনিক শ্রেণীর আর্বিভাব ঘটেছিল তেমনি তাদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রভূত পরিবর্তন এনেছিল। এই সকল শিল্পপতিগণ ভারতকে তাদের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করার চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে

কেবলমাত্র ভারতবাসীকে শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যেই রাখলে তাদের বাজারে বিকাশ ঘটবে না। ভারতবাসীর সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন তথা আধুনিকীকরণ করতে না পারলে ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার তারা করবে না ব্রিটিশরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটেন তথা ইউরোপ নব জাগরণের ফলে ভারতে ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সারা পৃথিবীর মানুষের মন উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। অন্যদিকে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের স্মরণীয় ফরাসী বিপ্লব সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে মানুষের মনে গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে আধুনিক কালের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। নতুন চিন্তা ধারার প্রবক্তা ছিলেন বেকন লক্ ভলটেয়ার, রুশো কান্ট, এডাম স্মিথ এবং বেন্থাম প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর জড়তাবোধ, সংকীর্ণতাবোধ প্রভৃতির ভাঙ্গন এনেছিল শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব। এই নবজাগরণের প্রভাব ভারতবর্ষেও পড়েছিল। ভারতে ইংরেজ শাসক কুলও টের পেয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে শাসনকার্যাদি পরিচালনার পদ্ধতির পরিবর্তন এসেছিল। মানবিকাবোধ, সহানুভূতি, ন্যায় ইত্যাদির লক্ষ্য কিছু কিছু দেখা দিয়েছিল। ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসককুলদের মধ্যে দুটি দল সৃষ্টি হয়। প্রাচীন পন্থী ও নব্যপন্থী। প্রাচীনপন্থীগণ ভারতবর্ষে শাসক নীতি যথা সম্ভব অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতের সামাজিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করে তাড়াহুড়ো কোন কর্মধারা অনুসরণ করায় এঁরা বিরোধী ছিলেন। কোন ধরনের সমাজ-সংস্কার করাতেও তারা ভীত ছিলেন। এই রক্ষণশীল মনোভাব গোটা ইংল্যাণ্ডের শাসককুলদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ফলে ভারতবর্ষের শাসকগণদের পরিবর্তন হয় নি। নব্যপন্থীগণ তদানীন্তন ভারতের প্রচলিত সামাজিক অবিচার সমূহ যথা জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, অবাঞ্ছিত শিশু হত্যা, নারী জাতি বিশেষতঃ বিধবাদের হীন অবস্থা প্রভৃতির বিরুদ্ধে পরিবর্তন আনার চেষ্টায় বিচলিত ছিল। ভারতের সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল কুসংস্কারসমূহ এবং মুক্তি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি নব্যপন্থীদের চিন্তিত

করে তুলেছিল। এবং ভারতে ইংরেজ শাসন নীতির পরিবর্তন আনারও চেষ্টা চালিয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় এবং তার মতো চিন্তাসম্পন্ন অন্যান্য ভারতীয় ব্যক্তিদের সমর্থন লাভ করেছিল। তথাপি ভারতে ইংরেজ শাসককুল ছিল রক্ষণশীল। তাড়াতাড়ি পরিবর্তনে আনতে গিয়ে যদি কোন বিপদ ডেকে আনেন সে ব্যাপারেও তারা সতর্কমূলক পদক্ষেপ নিতেন। তারা ভারতবাসীর গণচেতনা বা গণতান্ত্রিক মনোভাবকে ভয় পেতেন। সে কারণেই তাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই ব্যাপক পরিবর্তন বা দ্রুত পরিবর্তন আনতে চান নি। এমন কি সরকারীভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে কু-প্রথা দূরীকরণের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নি। রাজা রামমোহনের পরিচালিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, গণ চাপ যখন সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তখনই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বেন্টিক এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এবং সতীদাহ প্ররোচনা দান বা সহায়তা করাও গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে ঘোষণা করেন। অতীতে 'আকবর ও আওরঙ্গজেব এবং জয়পুরের জয়সিংহের মতো অনেক ভাবতীয় ব্যক্তি এই সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করতে উদ্যোগী হলেও সফল হতে পারেন নি। সতীদাহ প্রথাব বিরুদ্ধে আইন থাকা সত্ত্বেও এই প্রথা বন্ধ করা যায় নি। ব্রিটিশ সরকার কেবল আইন কবেই এ ব্যাপারে ক্ষান্ত ছিলেন কারণ তারা মনে করতেন ভারতীয় ধর্ম বা সামাজিক রীতিনীতির উপর বেশী আক্রমণ করলে হয়ত হিন্দু সমাজ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী জাতীয় শিশুহত্যার মতন জঘন্যতম কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও সরকার কেবলমাত্র আইন করেছিলেন। কিন্তু এই নরবলি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার অবসান হয় নি। দেশে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহে অংশ নিয়ে প্রাণ হারাত বহু যুবক, অন্যদিকে খাদ্য সমস্যায় মারা যেত বহু মানুষ। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এই কু-রীতির প্রচলন ছিল বেশী। একদিকে খাদ্য সমস্যা অন্যদিকে বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা কম থাকায়, পণপ্রথার রীতি চালু হলে বহু দরিদ্র পরিবার স্ত্রী-কন্যা জন্মাবার সাথে সাথেই হত্যা করত। ১৭৯৫ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে

শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হলেও সেটি নিয়মিত কার্যকর হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারা পরিচালিত বাল্য বিবাহ রোধ ও বিধবা বিবাহ চালু করার আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সরকার আইন করেছিলেন বটে কিন্তু বিশেষ কোন সুফল পাওয়া যায়নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোঘল সাম্রাজ্যের মতন ইংরেজ সাম্রাজ্যও ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতির কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা ভারতবর্ষে গড়ে উঠতে পারে নি তখন থেকেই। কারণ একদিকে যেমন উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান বিলাসিতা, আভিজাত্য, বর্বরতা নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদ করতে ব্যস্ত ছিল অন্যদিকে কেবল অর্থনৈতিক লুণ্ঠন করা ছাড়া আর কিছু ভাবার প্রবণতা সেই সময় উচ্চশ্রেণীর ছিল না। এমন কি ভারতবর্ষের মানুষদের মধ্যে শিক্ষার বিকাশ ছিল কেবল নামে মাত্র। শিক্ষা ছিল উচ্চশ্রেণীর কুক্ষিগত। ইংরেজরা শিক্ষাকে ধর্মান্তর কাজে ব্যবহার করতেই ব্যস্ত ছিলেন। তবে কখনও সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেনি। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু রাজাই হোক আর মুসলমান রাজাই হোক শত্রুর বিরুদ্ধে জোট বদ্ধতা পালন করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। পরস্পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মকে কেন্দ্র করে কখনও যেমন কলহ হত না তেমন আবার পরস্পর পরস্পরে ভাইয়ের মতন আচরণ করতেও দেখা যেত বিশেষ করে জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাব বেশি পোষণ করত। কি শহরে কি গ্রামে গরীব শ্রেণীর মানুষ সকলেই একসাথে বসবাস করত। নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বিনিময়ে করত। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতেও যোগদান করত। অন্যদিকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেও সমভাবাপন্ন মনোভাব বিশেষ করে দেখা যেত। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে দুটি শ্রেণীর মানুষই সমাজে দেখা যেত। উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী, জাতিগতভাবে বা ধর্মগতভাবে মানুষের মন গড়ে উঠত না। শ্রেণীর দ্বন্দ্বই ছিল প্রধান। দুই শ্রেণীর জীবনধারা ছিল বিভিন্ন ধরনের। আঞ্চলিক রূপ-ভেদই ছিল প্রধান কারণ, ধর্ম নয়। এক

একটি প্রদেশ বা অঞ্চলে একই ধরণের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চরিত্র ফুটে উঠতে দেখা যেত। এক অঞ্চলের সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একই ধরণের হয়ে উঠত। অন্যদিকে নগর এবং গ্রামের সংস্কৃতি ভিন্নরূপ ছিল কারণ নগর বাসীদের জীবনধারা গ্রামবাসীর জীবনধারার তফাৎ থাকায় এই পরিবর্তন দেখা দিত। ধর্ম কখনও মানুষের সামাজিক ও সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে পারে নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের উচ্চশ্রেণী বা শাসকশ্রেণীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান, রুচি নিম্নবর্ণের হয়ে উঠেছিল। তাদের সামাজিক পশ্চাৎপরতা এবং সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ভারতের একশ্রেণীর মানুষের নৈতিকতার উপর সুদূরপ্রসারী অশুভ প্রভাব কার্যকর হয়েছিল। এদের ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবন দুষিত হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের নৈতিক জীবনে তেমন কোন রেখাপাত করতে পারে নি।

প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষে এক সহজ ও স্বচ্ছন্দ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক ইতিহাস খুব একটা পাওয়া যায় না। ইংরেজরা এই ইতিহাস জানার জন্য এক পরিসংখ্যান চালায় যা মূলতঃ তাদেরই শাসিত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উইলিয়াম অ্যাডামকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে বললে তার থেকেই কিছু ইতিহাস জানা যায়। বিবরণটি সম্পূর্ণ না হলেও তৎকালীন ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পরিস্কার চিত্র পাওয়া যায়।

শ্রেণী বিভাগ : অ্যাডামের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে, সেই সময় মোটামুটি দুই শ্রেণীর দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয় চলতো বর্তমান ক্লাস ব্যবস্থা সমন্বিত ব্যবস্থায় নয়। সেগুলি ছিল নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে পরিচালিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের এক প্রকার মাধ্যম। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আবার দুই শ্রেণীর ছিল ফার্সী ভাষা যেখানে শেখানো হত সেগুলিকে বলা হত মক্তব এবং দেশীয় ভাষা যেখানে শেখানো হত সেগুলিকে বলা হত পাঠশালা। উচ্চ বিদ্যালয়ও ছিল দুই শ্রেণীর হিন্দুদের টোল এবং মুসলমানদের মাদ্রাসা।

শিক্ষার হার : অ্যাডামের বিবরণ অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে ৪০০ জন দেশবাসীর জন্য এই ধরণের দেশীয় বিদ্যালয় ছিল এবং বাংলা বিহারেই মোট সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। এই হিসাবের উপর নির্ভর করে বলা যেতে পারে সে সমগ্র ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ এই ধরণের বিদ্যালয় ছিল। স্ত্রী বা নারী শিক্ষার কোন বিদ্যালয় ছিল না বললেই চলে। আনুমানিক ৩০/৩২ জন ছেলের জন্য একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রায়ই গ্রামে ছিল। ৫-১৪ বছরের বয়সের ছেলেরা গড়ে শতকরা ৭ জন বিদ্যালয় শিক্ষালাভ করে।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম : প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়-গুলিতে প্রধানতঃ লিখন, পঠন, প্রাথমিক গণিতই শেখানো হত। এছাড়া কিছুটা হিসাব শেখানো এবং ধর্মগ্রন্থ পড়ান হত। প্রথমে বর্ণমালা এবং পরে সেগুলো লিখতে শিখতো। তারপর ধীরে ধীরে শব্দ ও ছোট ছোট সহজ বাক্য লিখতে শিখতো। শেষে বড় চিঠি, আবেদনপত্র, অনুদানের আবেদন, জমির ইজারা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় চিঠিপত্র লিখতে শিখতো। অর্থাৎ জীবনের চাহিদার উপর ভিত্তি করে অনেকটা শিক্ষা দেওয়া হত।

শিক্ষক : এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন সরলমনা, দরিদ্র এবং স্বল্প বিদ্যাসম্পন্ন। শিক্ষকবৃত্তি সমাজে তেমন কোন সমাদৃত পেত না। শিক্ষকদের আয় ছিল খুবই কম। ছাত্রদের পরিবারদের সাহায্যের উপরই নির্ভর করতে হত সকল শিক্ষকদের। শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষা না থাকার ফলে তারা যতদূর জানত ততটুকুই পড়াত। ভাল করে পড়ানোর সামর্থও ছিল না শিক্ষকদের। শিক্ষণীয় বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করে তোলার কোন প্রবণতাই ছিল না। সেই জন্যে পড়াশোনার বিশেষ কোন অগ্রগতি হত না। শাসন ছিল কড়া। ছাত্রদের শাস্তির জন্য কঠোর ব্যবস্থা ছিল। একজন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে পড়ানোর ফলে ছাত্রদের মধ্যে একঘেঁয়েমিতা আসত।

শিক্ষার উপকরণ : সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থায় একেবারে কোন প্রকার শিক্ষার উপকরণ ছিল না। ছাপা বই কিংবা শ্লেট, পেন্সিল, তালপাতা ইত্যাদিও সবসময় ব্যবহার হত না। স্কুলে ভর্তির জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। বছরের যে কোন সময় থেকে শুরু করা যেত। শিক্ষার উপকরণ বলতে কেবল শ্রুতিই ছিল। শিক্ষক পড়তেন এবং ছাত্ররা শুনে মুখস্থ করত এছাড়া কোন প্রকার আধুনিক উপকরণ ছিল না ফলে শিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি।

এই ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যাপকতা থাকলেও বিভিন্ন জাতির বা ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন হিন্দুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শহর ও গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মসজিদের সঙ্গে যুক্ত

মৌলভীদের দ্বারা চালিত মক্তবগুলি থেকে মুসলমান ছেলেরা শিক্ষা পেত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেরা অক্ষর চিনে লিখতে শিখত এবং অংকও শিখত। হিন্দুদের মধ্যে এই শিক্ষা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও বৈশ্য শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তথাকথিত নিম্নবর্ণের ছেলেদেরও এই শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখা যেত। এবং কোন-মতেই মেয়েদের শিক্ষালাভে উৎসাহ দান করা হত না। যদিও উচ্চবর্ণের বা শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা দেখা দিত। ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা সকল সময়ই অবহেলিত হয়েছিল। কোন সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক মানুষের মধ্যে শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থাই ছিল না আর যেগুলোও ছিল, সেগুলো বহু ত্রুটিপূর্ণ ছিল। চিরাচরিত ধারায় শিক্ষা দেওয়া হত, প্রাতীচ্যের বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এই শিক্ষার সম্পর্ক মাত্র ছিল না। সাহিত্য, আইন, ধর্ম, দর্শন, তর্কশাস্ত্র এইসব ছিল অধীতব্য বিষয়। পদার্থ বিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি তৎকালীন ভারতে সাধারণ পাঠ্য বহির্ভূত বিষয় ছিল। সমাজের বাস্তব অবস্থা ও তার যুক্তি সঙ্গত সমাধানের বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা তদানীন্তন শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল না।

দেশের নানা স্থানে উচ্চ শিক্ষাদানের কেন্দ্র ছিল। সাধারণতঃ রাজা নবাব ও ধনী জমিদারদের অর্থ সাহায্যে এগুলি পরিচালিত হত তাদের পরিবারের ছেলেপুলেদের জন্য। শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্রিটিশকালে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীদের ভূমিকা

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে ভারতবর্ষে যে আর একটি বহিরাগত শক্তির আবির্ভাব হচ্ছিল তা ছিল ইংরেজ শাসন।

মূলতঃ ইংরেজের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মারফৎ। যদিও এই কোম্পানী আসার আগে থেকেই বহু মিশনারী, ধর্ম প্রচারক ভারতে প্রবেশ করেছিল তাদের নিজেদের প্রভুদের জন্য পথ পরিস্কার করতে। ভারতবর্ষে শাসন চালানোর জন্য বা নিজেদের সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রত্যেক শাসকই মিশনারীদের বা ধর্ম প্রচারকদের ভালভাবেই কাজে লাগিয়ে ছিল। বিশেষ করে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল ইংরেজ মিশনারীর দল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৃটেনের পার্লামেন্টের সনদের ক্ষমতায় ভারতের বুকে কোম্পানী শাসনকার্য বাণিজ্য দুই-ই চালাত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট কোম্পানীর হাত থেকে ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেয় এবং ভারতের শাসনকার্য আরও সু-পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। তার মধ্যে ধর্ম ও শিক্ষা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ ইংরেজ সরকার বেশ ভালভাবেই জানত ভাবতীয়দের উপর কর্তৃত্ব করতে হলে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ করতে হবে। আর তা করার জন্য ইংবেজ সরকারকে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভালভাবে কাজে লাগিয়েছিল। যেমন—(এক) মিশনারী যারা ধর্ম প্রচারের কাজে যুক্ত ছিল, (দুই) কোম্পানীর কর্মচারী বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি যারা নিজ প্রচেষ্টায় শিক্ষার বিস্তার করছিল এবং (তিন) যারা মিশনারী বা কোম্পানীর সঙ্গে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট নন, এমন সব দেশীয ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে

ভারতে শিক্ষার বিস্তার করার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের নিজস্ব কর্মচারী বা এমন একদল শ্রেণীর সৃষ্টি করা যা নাকি মূলতঃ ইংরেজ শাসক শ্রেণীর তল্পীবাহকরূপেই কাজ করবে অর্থাৎ ভারতের বাইরে ইংরেজরা যাতে দীর্ঘদিন সম্পদ নিয়ে যেতে পারে তার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা। এই শিক্ষা শুধু ভারতীয়দের জন্যই ছিল না এমনকি যে সমস্ত কর্মচারী ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে কোম্পানীর কর্মচারী হয়ে আসত তাদের জন্যেও শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় তার জন্য প্রত্যেক আগত কর্মচারীকেই বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা নিতে হত। সেই উদ্দেশ্যেই ১৮০০ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। সে সময়ের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি মনে করেছিলেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মীদের এমন সব জটিল শাসনমূলক দায়িত্ব পালন করতে হয় যার জন্য

তাঁদের নিছক ইংরাজী শিক্ষা বা নিছক ভারতীয় শিক্ষা থাকলে চলবে না। তাদের জন্য দরকার এমন একটি মিশ্র ধরণের শিক্ষা যার ভিত্তি রচিত হবে ইংল্যাণ্ডে, কিন্তু সংগঠনটি সম্পূর্ণ হবে ভারতে। অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মীদের মূল শিক্ষা ইংল্যাণ্ডে সম্পন্ন হলেও ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের এদেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্যই লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। যারা কোম্পানীতে চাকরী নিয়ে ভারতে আসতেন তাদের জন্য এই কলেজে শিক্ষাগ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক। এই প্রসঙ্গে লর্ড ওয়েলেস্‌লির একটি বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রশাসনের কাজের জন্য কোন কর্মীকেই যোগ্য বলে গণ্য করা যাবে না, যদি না তিনি এই দেশের আইন-কানুন এবং ভাষার একটি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। এখন থেকে এই আইন-কানুন এবং ভাষার জ্ঞান যোগ্যতার অপরিহার্য মান বলে গ্রহণ করা হবে।

ইংরেজ সরকার বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই নিজের সুযোগ্য শিষ্য তৈরী করত তাদেরই তৈরী কারখানায়। কঠিনভাবে প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা করা হত এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেবার জন্য প্রতি বৎসরে সকল শিক্ষার্থীদের পারিতোষিক ও অন্যান্য লোভনীয় পুরস্কার দেওয়া হত।

কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষাই শিক্ষা নয়, বিভিন্ন বিষয় পড়ান হত, যেমন··· ভাষার মধ্যে আরবী, ফারসী, সংস্কৃত হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেলেগু প্রভৃতি সকল ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। এছাড়া আইন শিক্ষার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান আইন, নীতিশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্র ব্রিটিশ আইন এবং গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত আইন পড়ান হত সেই সাথে পড়ান হত ভারতীয় ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি।

এই সকল কলেজের অধ্যাপক কেবল বিদেশীই নয়, বহু দেশীয় পণ্ডিতরাও নিযুক্ত ছিলেন।

ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা ছিল অত্যাধিক।. এদের কাজ ধর্মপ্রচার করাই ছিল না, সেই

সাথে ভারতীয় সংস্কৃতিতে খ্রীষ্টধর্মের এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব ফেলার কাজও ছিল। যদিও এর ফলে বহু ভারতীয় পণ্ডিতদের, ইংরেজ শিক্ষাবিদদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করার সুযোগ ঘটেছিল এবং পিছিয়ে পড়া ভারতবাসীর বিকাশের দরজা উন্মুক্ত হতে পেরেছিল।

একদিকে ভারতের ভূমি যেমন ছিল উর্ব্বর এবং নানান সম্পদে ধনী, অন্যদিকে ভারতবাসী ছিল নিরক্ষর, অজ্ঞ, পিছিয়ে পড়া কৃষক। দুটোই ইংরেজ শাসক এবং বণিকদের সহায়ক ছিল। তাই একদিকে যেমন শয়ে শয়ে ব্যবসায়ী ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করল আর একদিকে তখন হাজারে হাজারে মিশনারী ভারতের বুকে নিজেদের আখড়া তৈরী করল খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করার জন্য অজ্ঞ ভারতবাসীকে বুঝিয়ে পাড়িয়ে নিজেদের মানুষ তৈরী করার কাজ শুরু করল। মিশনারী আর কোম্পানীর লোকেরা চালাতে শুরু করল একচেটিয়া বাণিজ্য। শোষিত হতে শুরু হ'ল লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘাম ঝরানো ফসল

শ্রীরামপুর মিশন

ভারতে যে সকল মিশনারী প্রতিষ্ঠান পদার্পণ করে তার মধ্যে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডঃ উইলিয়াম কেরী। তিনি ১৭৯২ সালে ডঃ টমাসের সঙ্গে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে পদার্পণ করেন। প্রথমে কলকাতায় পরে ব্যাণ্ডেলে বাস করেন এবং পরিশেষে চাকরী নিয়ে মালদায় যান এবং সেখানে বাংলা ভাষা শেখেন এবং বাইবেল অনুবাদ করে ধর্মপ্রচার করেন নিজেরই কারখানায় হিন্দু ও মুসলমান কর্মীদের মধ্যে, পরে শ্রীরামপুরে তাদের নিজস্ব মিশন স্থাপন করেন এবং একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে থেকে কেরী মার্শমান ও ওয়াড কেরী আরও দুই সাথী ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল স্থাপন, বাইবেল অনুবাদ এবং বাংলা ভাষায় বই লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এদের উদ্যোগে বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে ১১১টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরা এদেশে প্রথম মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয় এবং আর একটি

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল বাংলাভাষায় পত্রিকা প্রকাশ। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করার জন্য এই প্রতিষ্ঠান যেমন উদ্যোগ নেয় ইংরেজ ও কোম্পানীর শাসকদের জন্য, তেমনি কালক্রমে তারা ভারতীয় শিক্ষা বিস্তারেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যান।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি

রেভারেণ্ড নাথানিয়েল ফরগাইথ ১৭৯৮ সালে বাংলাদেশে এই মিশনারী প্রতিষ্ঠানটির প্রবেশ করান। চুঁচুড়ায় মিশনের প্রথম সংগঠন স্থাপন হয় এবং পরে কলকাতার ভবানীপুরে ও ১৮২৪ সালে বহরমপুরে মিশন স্থাপন করেন। ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তারের কাজেও তারা নিযুক্ত হন এবং ৩৬টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চার্চ মিশনারী সোসাইটি

চার্চ মিশনারী সোসাইটি ১৮১৬ সালে বর্ধমানে দুটি স্কুল স্থাপন করে এবং বর্ধমান থেকে খুলনার নদীয়ায় এদের কাজ প্রসারিত হয়। কলকাতার মির্জাপুরে এদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরে এদের প্রতিষ্ঠান আগ্রা. মিরাট, বেনারস, আজমগড় ও জৌনপুরে বিস্তৃত হয়, এইভাবে এই মিশনারী সোসাইটি বহু জায়গায় নিজেদের প্রভাব ফেলে এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। শুধু মাদ্রাজেই এই মিশন ১০৭টি বিদ্যালয় স্থাপন করে। শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে এরা ধর্ম প্রচার কার্যও চালিয়েছিল। নানান ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছিল এই মিশন।

অন্যান্য মিশনারী প্রতিষ্ঠান

সোসাইটি ফর প্রমোটিং খ্রীশ্চিয়ান কলেজ বা প্রাচীন খৃষ্টিয় জ্ঞান প্রসারের সমিতি ১৭৯৭ সালে এ দেশে ধর্ম প্রচারের কাজে আসে। এছাড়া কলকাতার বিশপস্ কলেজের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অর্থ সাহায্য দান করে সোসাইটি ফর প্রভোগেশন অফ দি গস্‌পেল বা ধর্মবাণী প্রচার সমিতি ১৮২০ সালে। একই সময় বহু মিশনারী ভারতে পাঠান হয় ধর্মপ্রচারের জন্য।

এছাড়া ওয়েসলিয়ান মেথডিস্ট মিশনারী সোসাইটি জেনারেল এ্যাসেম্‌ব্লি অফ দি চাচ অফ স্কটল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস মিশনারী সোসাইটি প্রভৃতি বহু মিশনারী সংস্থা ভারতে আসে ১৮১৭ থেকে ১৮৩০ এর মধ্যে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে ১৮১৩ সালের কোম্পানীর সনদে মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করার পর থেকেই মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টা প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে সর্ব-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৮৩৩ সালের মধ্যেই এদেশে বহু ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

১৮৩৩ সালের সনদের সুযোগ নিয়ে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের মিশনারীরাই এসেছিলেন তাই নয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের বসবাসেচ্ছু ব্যক্তিদেরও ভারতে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। তার ফলে কয়েকটি প্রখ্যাত জার্মান ও আমেরিকান মিশনারী প্রতিষ্ঠান এদেশে প্রবেশ করে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য। যেমন জার্মান প্রতিষ্ঠান ব্যাসেল মিশন সোসাইটি (১৮৩৪) লুথেরান মিশনারী সোসাইটি (১৮৩৬) প্রভৃতি। আমেরিকান মিশনারী প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে আমেরিকান ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন, আমেরিকান বোর্ড, আমেরিকান প্রসবিটেরিয়ান মিশন ও বোর্ড নর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কোম্পানীর সনদ ও মিশনারী ধারা—১৬০৮ :

অন্য সমস্ত ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়কে রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করে ইংরেজ বণিকেরা যখন ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করল তখন থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারা এবং ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টারিয়ানরা ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করে। ফলে ১৬০৮ সালে কোম্পানীর সনদ (চার্টার) আইন পুনঃ-প্রবর্তিত হওয়ার সময় পার্লামেণ্ট কর্তৃক তাতে মিশনারী সংক্রান্ত একটি ধারা সন্নিবিষ্ট করা হয়। যাতে বলা হয় যে ভারতবর্ষস্থ ইংরেজ কোম্পানীগুলিতে ধর্মযাজক নিযুক্ত করতে হবে এবং যেখানে সম্ভব সেখানে একটি ক'রে স্কুল স্থাপন করতে হবে। যদিও কোম্পানীতে কর্মরত হিন্দুদের ধর্মান্তর করার উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছিল।

আইন পাশ হওয়ার ফলে ভারতে মিশনারীদের কার্যকলাপ প্রচুর বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং এরই ফলে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে খৃষ্টিয় জ্ঞান প্রচার সমিতি— (Society for promoting Christian knowledge) স্থাপিত হয়ে ছিল। এই সমিতির উদ্যোগে বহু অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রখ্যাত মিশনারিদ্বয় জিগেন বাল্ক ও প্লুসৎ সাউ ১৭০৬ সালে ত্রিবাঙ্কুরে সর্বপ্রথম একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৭১৫ সালে রেভারেণ্ড ষ্টিভেন্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজের সেণ্ট মেরিজ চ্যারিটি স্কুল, ১৭১৯ সালে রেভারেণ্ড কোবের প্রচেষ্টায় বোম্বাইতে এবং ১৭২০ সালে মিশনারী বেলামীর প্রচেষ্টায় কলকাতায় একটি ক'রে চ্যারিটি স্কুল স্থাপিত হয়। এইভাবে বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মিশনারীরা ভারতবর্ষের বুকে একের পর এক।

শিক্ষা বিস্তার এবং ধর্ম প্রচার করার জন্য কোম্পানী নানাভাবে মিশনারীদের সাহায্য করত, যেমন—

১। স্কুলগুলিতে পৌনঃপুনিক খরচের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হত।

২। লটারীর সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে স্কুল চালু রাখার জন্য অনুমতি দেওয়া হত।

৩। স্কুল ভবন নির্মাণকল্পে এককালীন অর্থ সাহায্য দেওযা হত।

৪। স্কুল তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ উচ্চ সুদে কোম্পানীর কাছে জমা রাখা যেত।

মিশনারীদের দ্বারা এই সকল স্কুলে প্রধানতঃ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হলেও ভারতীয় ভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত কারণ মিশনারীরা মনে করত ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় ভাষাই সুবিধা। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্বপক্ষে ছিল বলে কোম্পানী মুক্তহস্তে এই সকল মিশনারীদের অর্থ সাহায্য করেছে। কিন্তু কালক্রমে তার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিকে কোম্পানীর উদারতা মিশনারীদের প্রতি, অন্যদিকে ধর্মান্তর করার জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির ফলে মিশনারীদের বিরোধিতা করা ছাড়া কোন

উপায় ছিল না কোম্পানীর। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলে বিরাট ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করার উচ্চাশা দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা রাজনৈতিক অশান্তি বন্ধ করার জন্য কোম্পানী উঠে পড়ে লাগলেন, কারণ, তারা জানতেন দীর্ঘদিন শাসন করার জন্যও ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাস অক্ষুন্ন রেখে নিরপেক্ষতা পালন করাই চতুর শাসকের লক্ষণ হবে। ফলে শুরু হয় কোম্পানীর সঙ্গে মিশনারীদের দ্বন্দ্ব। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বাধা দিতে লাগলেন কোম্পানী স্বয়ং। যে সকল সুযোগ সুবিধা মিশনারীরা ভোগ করতেন তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে অভিমত দিলেন।

কোম্পানী সনদ (১৮১৩)

১৮১৩ সালে সনদ আইনটি (Charter Act.) পুনঃ প্রবর্তিত করা হল। সনদে ভারতীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতিকল্লে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুমতি দেওয়া হল। যে শিল্প ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই এবং ভারতীয়দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তার ও সাহিত্যের উজ্জীবনের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হবে। মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে যে সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব কোম্পানীর মধ্যে ঘটেছিল, তার নিন্দা করে চার্লস গ্রাণ্ট মন্তব্য করেন, যে ভারতের সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের শোচনীয় অবস্থা দূর করার জন্য সেখানে অবিলম্বে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ ভারতে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্বটা সরকারেরই। ফলে সনদ গ্র্যাণ্টের এই নীতির সমর্থন করল। এই নীতি যেমন শিক্ষাকে সরকারের দায়িত্বে নিয়ে গিয়েছিল তেমনি মিশনারীদের পুনরায় জীবিত করেছিল। ১৮১৩ সালের সনদ আইন মিশনারীদের ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে প্রচুর স্বাধীনতাও দেওয়া হল। মিশনারীরা নবোদ্যমে পুস্তক প্রকাশ, নারী শিক্ষা বিস্তার, অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা এমনকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে পর্দানশীল মহিলাদের মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়।

মিশনারী শিক্ষার ক্রমবিস্তার ঃ

ফলে মিশনারীদের কার্যকলাপ আরও দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তাদের শিক্ষানীতির মধ্যে কিছুটা পবিবর্তন দেখা যায়। ১৮৩৩ সালের আগে মিশনারীরা মূলতঃ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে তাঁরা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করে। এর পিছনে দুটি কারণ ছিল—(১) যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা লাভ করানো যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়রা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং (২) উচ্চবর্ণের হিন্দুদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা যাবে। কারণ উচ্চবর্ণের লোকেরা উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে মিশনারী প্রতিষ্ঠানে আসলে পরে, বাধ্যতামূলক ভাবে বাইবেল শিক্ষা দেওয়া যাবে এবং সহজেই তাদের খ্রীষ্টান করা যাবে। এই উদ্দেশ্যেই মিশনারীরা প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা শুরু করে। এই ভাবনা অন্যান্য মিশনারীদের মধ্যে সুড়সুড়ি দেয়।

১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করলে ইংরাজী মাধ্যমে বাইবেল শিক্ষা দান করা সুযোগ হবে ভেবে অন্যান্যরাও দ্রুত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৮৩০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কে তাই 'মিশনারী বিদ্যালয় কাল' বলা হয়। কিন্তু ইংরেজ মিশনারীদের আশা ব্যর্থ হল। উচ্চ হিন্দুবর্ণের লোকেরা ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাল না। চাকরী পাবার আশায় কেবল তারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে লাগল। তা সত্ত্বেও ধৈর্য-সহকারে মিশনারীরা তাদের কার্যাবলী চালাতে লাগল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৭০ সাল নাগাদ মিশনারীরা তাদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতা উপলব্ধি করল এবং উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ কমাতে লাগল।

একই সঙ্গে কোম্পানীও ইংরাজী স্কুল চালাতে শুরু করে, স্বাভাবিক ভাবে তাদের প্রচুর অর্থ থাকাতে ঐ বিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে এবং মিশনারী স্কুলগুলির সম্মুখীন হতে হয়। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট যদিও ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা মিশনারীদের হাতেই ছেড়ে দেয়

তথাপি কোম্পানী পরিচালিত স্কুল চলতে থাকলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং মিশনারীরা কয়েকটি দাবী তোলে পার্লামেণ্টে যেমন— (ক) ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্ট কোন স্কুল পরিচালনা করে না এবং সেইমত কোম্পানীও ভারতে কোন স্কুল চালাবে না। (খ) ইংল্যাণ্ডে দরিদ্র বালক-বালিকাদের শিক্ষার ভার চার্চ গ্রহণ করে এবং ভারতবর্ষেও চার্চকে সেই দায়িত্ব দিতে হবে। (গ) কোম্পানী মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলগুলির উপর থেকে কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করবে এবং (ঘ) মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলগুলিকে যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য দেবে।

প্রতিবন্ধক ও প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও মিশনারীরা হতাশ না হয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব আধিপত্য ফিরে পাবার জন্য ইংল্যাণ্ডে বারবার আন্দোলন শুরু করে এবং ইতিমধ্যে মিশনারীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কিন্তু না সরকার না উচ্চবর্ণের বা শ্রেণীর সহানুভূতি পেল ফলে মিশনারীরা তাদের প্রচেষ্টায় গরীব এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে কাজ শুরু করে। শুধু তাই নয়, তারা ভালভাবেই জানতেন যে সাধারণ মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে খুব সহজেই খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করা যায় বা ধর্মান্তর করা যাবে।

১৮৭২ সালে এলাহাবাদে মিশনারীদের এক সম্মেলন হয়, তাতে অনেক মিশনারীরা এই অভিমত প্রকাশ করে যে স্কুল কলেজে পড়ানটাই মিশনারীদের প্রকৃত কাজ নয়। একই অভিমত ১৮৮৩ সালে কলকাতায় এবং ১৮৯২ সালে বোম্বাইতে মিশনারীদের সম্মেলনে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ পায়।

গ্রাম-গঞ্জে মিশনারীদের প্রবেশ শুরু হয়। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য মিশনারীরা আবাসিক স্কুল, বৃত্তি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে শুরু করে এবং সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহার শুরু করে আরও ব্যাপকভাবে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা শুরু হয়। ১৯১৯ সালে রেভারেণ্ড ফ্রেজার নামে একজন মিশনারী যার নেতৃত্ব দেন। ফ্রেজার কমিশন মত প্রকাশ করেন যে

গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, শিক্ষক-শিক্ষণ ও ধর্মশিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। তারই প্রতিফল আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজও চলে আসছে। মিশনারীরা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন ভাবে সাজাতে শুরু করে। সংগঠন থেকে শুরু করে বিষয়বস্তু, পদ্ধতি সাজ-সরঞ্জাম সবের উপরই মিশনারীদের চিরস্থায়ী প্রভাব রাখার চেষ্টা করেছে।

তারাই প্রথম শিক্ষাক্ষেত্র ক্লাস, পিরিয়ড, শিক্ষার পাঠ্য পুস্তক, নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়ানো প্রভৃতি চালু করে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গুরু মহাশয়ের উপরই নির্ভর ছিল এককভাবে। কোন পাঠ্যপুস্তক বা পিরিয়ড, ক্লাস ইত্যাদি ব্যবহার হত না তার কারণ সেই সময় মুদ্রণ ব্যবস্থা ছিল না। মিশনারীরাই প্রথম মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু করে এবং পুস্তক প্রকাশ করে।

অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের পিছিয়ে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে যেমন মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল অন্যদিকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করার পথও পরিস্কার করেছিল এই মিশনারীগণ। শুধু শিক্ষাদানই মিশনারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতবাসীদের খৃষ্টধর্ম দীক্ষিত করা এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাদের শিক্ষিত করার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য উপযুক্ত ভারতীয় কর্মী গঠন করার উদ্দেশ্যেও শিক্ষা বিস্তার করে এবং কোম্পানী বা ইংল্যাণ্ড রাজ ভারতবর্ষের মানুষদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও ভারতীয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে বেছে নেয় একদিকে যেমন, তেমনি অন্যদিকে ইংরেজদের সঙ্গে মধ্যস্থ করার মতন ভদ্রবাবুদের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়াও মিশনারীদের কাজ ছিল। যে সকল মিশনারীগণ বা ইংরেজ ব্যক্তি যারা কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এমনই কয়েক জনের নাম হল ডঃ উইলিয়াম কেরী, আলেকজাণ্ডার ডাফ, ডেভিড হেয়ার জেহডি বেথুন, এলফিন্‌স্টোন, অধ্যাপক প্যাটেল প্রমুখ, যারা ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা নতুনভাবে সাজিয়েছিলেন এবং অন্যদিকে অল্প সংখ্যক ভারতীয় ইংরাজী শিক্ষা

ভারতে প্রবর্তন করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, মহাত্মা ফুলে ইত্যাদি। এরা প্রত্যেকেই আঠারো শতাব্দীতে ইংরেজের সহযোগিতায় ভারতে শিক্ষা বিস্তার করেন। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু অবদান রেখে গেছেন ভারতীয় শিক্ষায় এবং সাহায্যও করে গেছে ইংরেজ শাসক এবং মিশনারীদের।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার মিশনারীরা ঘটালেও ইংরেজ সরকারের নীরব ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ব্যাপক ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারে ব্রিটিশ শিক্ষানীতি জনশিক্ষা নীতি ছিল না। ফলে ১৮২১ থেকে ১৯২১ এই বছরগুলির মধ্যে হিসাব করে দেখা যায় সাধারণ মানুষ শিক্ষিত হতে পারেনি। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দেশের শতকরা ৯৪ জন মানুষ নিরক্ষর ছিল। ১৯২১ সালে নিরক্ষরের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৯২।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে অবস্থিত বোর্ড অব কণ্ট্রোল এর সভাপতি স্যার চার্লস উড্ ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপায়ণের এক বিশদ পরিকল্পনা রচনা করলেন যা উডের নির্দেশনামায় পরিস্কারভাবে বলা হয় যে ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল আদর্শ হল পাশ্চাত্যের উন্নত ধরণের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলার অর্থাৎ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতীয়দের মধ্যে প্রসারিত করা। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে ইংরাজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বাধিক উপযুক্ত হবে। সেই সাথে তিনি দেশীয় ভাষার উল্লেখ করে বলেছিলেন সর্বনিম্নে গ্রামে গ্রামে দেশীয় ভাষায় প্রাথমিক আর উপর স্তরে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাভিত্তিক হাই স্কুল এবং তার উপরে স্তরে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রত্যেক জেলায় কলেজীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বেসরকারী উদ্যোগে যাতে এই সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেজন্য সরকারী সাহায্যে ব্যবস্থারও নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। উড সাহেবের নির্দেশনামা সম্পূর্ণ ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণ মাত্র,

যেটা স্বাধীন ভারতেও অপরিবর্তিত অবস্থা চালু আছে। ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত বেসরকারী উদ্যোগে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে সমগ্র ভারতে মাত্র ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, ১৮৮২-তে দাঁড়ায় ৭২ টিতে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার স্যার উইলিয়াম হান্টারের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। ১৮৫৪-র উড সাহেবের নির্দেশনামা কতদূর কার্যকরী হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করা এবং কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা যায় সে বিষয়েই এই কমিশন গঠন করা হয়।

হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষাই জনসাধারণের শিক্ষার একমাত্র সুযোগ অথচ এটাই উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে অতএব বেসরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভর না করে সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার প্রযোজন। জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়ার কথা হাণ্টারের রিপোর্টে বলা হয়।

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ভিন্ন বাণিজ্যিক এবং কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেবার সুপারিশ করে হাণ্টার কমিশন। বেসরকারী উদ্যোগকে আরও সক্রিয় করার জন্য সরকারী অনুদান আরও দেবার পরামর্শ দেন হাণ্টার কমিশন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানদের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক তাও উল্লেখ আছে এই কমিশনে। কিন্তু পরবর্তীকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়াতে প্রাথমিক শিক্ষার ভীত একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বেসরকারী উদ্যোগে যেভাবে সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার বিস্তার করা হয়েছিল সেই ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ঘটেনি। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাটাই পরিণত হয়েছিল এক বিশেষ শ্রেণীর।

ভারতবর্ষে শিক্ষা কখনও বাধ্যতামূলক ছিল না বা করাও হয়নি। কারণ শাসক শ্রেণী কখনই চাইতো না অজ্ঞ ভারতবাসী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হোক। শুধুমাত্র তাদের স্বার্থসিদ্ধ হবে এমন কতকগুলি মুষ্টিমেয় ভারতবাসীকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। যদিও এ বিষয় নিয়ে বহুবার বহু কমিশন বসেছে। কেউ বলেছে শিক্ষার প্রয়োজন আছে কারণ

খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে সুবিধা হবে বা শিক্ষা দিয়ে ভারতীয়দের মনোভাব ইংরাজী করা যাবে এবং শাসনকার্য চালাতে সুবিধা হবে। প্রাচীনকালের শিক্ষা ব্যবস্থা তো আরোই খারাপ ছিল। মোঘল সাম্রাজ্যকালীন কিছু কিছু শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল মাদ্রাসা স্থাপন করে কিন্তু কখনই ব্যাপকতা লাভ করেনি ভারতবর্ষের শিক্ষা।

এবার দেখা যাক্ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আইন, যার দ্বারা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা চলেছিল। ইংরেজ শাসক কখনই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চালাত না বরং বিরোধিতাই করত। ফলে ভারতবর্ষের ব্যাপক জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। ভারতে রাজনৈতিক জাগরণের আন্দোলন শুরু হলে জাতীয়তাবাদী নেতা এবং কিছু সংস্কারবাদী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে নতুন ভাবে গঠন করার ইচ্ছা হয়। যদি এই সকল জাতীয় নেতা বা ব্যক্তির প্রচেষ্টার পিছনেও বহু ইংরেজ শাসকের মধ্যেকার লোকেদেরও হাত ছিল। ১৮৮৫ সালে সংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলে নেতারা উপলব্ধি করলেন দেশকে স্বাধীন করতে হলে জনসাধারণকে প্রথমে শিক্ষিত করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ জনসাধারণকে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন, অন্যদিকে বোম্বাইতে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা এবং স্যার চিমনলাল শীতলবাদ প্রভৃতি নেতাগণ বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিত ও শক্তিশালী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। ১৯১০ সালে রাজকীয় আইন সভায় তিনি প্রথম একটি এ বিষয়ে প্রস্তাব আনেন এবং ১৯১১ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি বিল উপস্থিত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলটি প্রত্যাখ্যান হয়। ইতিমধ্যেই প্রথম মহাযুরু শুরু হলে সমস্ত ব্যাপক ধামাচাপা হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ শেষ হলে নানাবিধ আইন প্রণয়ন হয়। ভারত ও ইংল্যাণ্ড উভয় দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে নানান আইন পাশ শুরু করতে লাগলেন।

১৯১৯ সালে ভারত সরকারের আইন পাশ হয় এইং ভারতীয়দের হাতে শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনের ভার

রাজ্য সরকারদের হাতে দেওয়া হয়। এর ফলে রাজ্যমন্ত্রীদের হাতে শিক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি চলে আসে। ১৯১৮ সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হতে শুরু হয়।

শিক্ষা বিস্তারে ভারতীয় ব্যক্তি

এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় ভারতের শিক্ষা ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেন কারণ একদিকে তিনি যেমন সমাজ সংস্কারক ছিলেন তেমন আবার শিক্ষাবিদ্‌ও ছিলেন। সমাজের কুপ্রথাগুলি ভাঙার জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন প্রচলিত সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে, অন্যদিকে সমাজে নারীদের পুরুষের মতন সমান মর্যাদাদানের স্বপক্ষে নারী শিক্ষা নিয়ে বহু চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আবার গোঁড়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম চালিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য শিক্ষারও চেষ্টা চালিয়ে ভারতের শিক্ষার ইতিহাস এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। সর্বসময় তিনি ইংরেজদের সহযোগিতায় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটতে সাহায্য করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একই ধরণের কাজ করেন ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃত বিস্তারে। আবার একই রূপ বহু ভারতীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষায় কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে হলেন—রাধাকান্ত দেবনাথ (১৭৮৩-১৮৬৭), গৌরশঙ্কর তর্কবাগীশ (১৭৯৯-১৮৫৯), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), মদন মোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র. মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭০), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩৯-১৮৭০), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪). শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ ১৯৪১), প্রমুখ ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন যদিও প্রায় প্রত্যেকে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে কম-বেশী সহযোগিতা করেছিলেন ইংরাজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য, তথাপি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আধুনিকীকরণ বা নবজাগরণ সৃষ্টি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন সকলেই।

ভারতে জাতি-সমন্বয় ও সংহতি

স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতবর্ষ বহু জাতি ও ধর্মের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মাটি খুঁড়ে যে সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে তা থেকে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, আর্য পূর্ব যুগ হতেই ভারতবর্ষে একটি উৎকৃষ্ট ধরণের সভ্যতার বিরাজ ছিল এবং ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর আদি ধর্মবিশ্বাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং ভারতবর্ষ থেকেই যে তা বিশ্বের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, সে সম্পর্কে বহু বিদেশী পর্যটকদের মন্তব্য পাওয়া যায়।

ধর্মই মানব ইতিহাসের সবচেয়ে পুরানো ও সমবেত প্রচেষ্টার ফল। ধর্ম বিশ্বাস একদিকে যেমন মানুষকে দুর্বল, অন্ধবিশ্বাস, নৃশংসতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে, তেমনি আধ্যাত্মিকতা, উদারতা, মানব প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিয়েছে। একদল মানুষ ধর্মকে কেন্দ্র করে জাত-পাতের লড়াই শুরু করে গোটা মানব সমাজকে ভাঙার চেষ্টা করছে, মানুষের শ্রেণী অবস্থানকে ধূলিসাৎ করে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে বিভেদ করার চেষ্টা করছে, নৃশংস হত্যালীলা, লুঠতরাজ ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করছে, মানুষের শ্রমশক্তি তথা উৎপাদনী মনোভাবের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাচ্ছে এবং বিঘ্নিত করছে জাতীয় সংহতি ও ঐক্যবোধ, অন্যদিকে মানুষকে করেছে ধর্মের প্রতি গোঁড়া, কুসংস্কারবদ্ধ প্রাচীনপন্থী। ঠিক একই পাশাপাশি আবার মানুষের মধ্যে ঐক্যের মিলনকে সদা-জাগিয়ে রাখার জন্য, সর্ব ধর্মকে সমন্বয়, এবং মানুষ এক, ঈশ্বর এক এই বাণী প্রচার করে গেছেন। বুদ্ধদেব, যীশু, হজরত, নানব, চৈতন্য, কবীর, রামানন্দ, অশোক, ও আকবর প্রমুখ মহামানব ও সম্রাটগণ বিশ্বে মানব প্রেমের প্রচার করে ঐক্যবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ গঠন করে গেছেন।

সকল ধর্মই মানুষকে ভালবাসতে বলেছে এবং সকল ধর্মের মধ্যেই রয়েছে এক আশ্চর্য্য ধরনের ঐক্যবোধ। ধর্মের মধ্যে মানুষকে তার অবস্থার মধ্যে রাখার বাণী থাকলেও প্রেম, ভালবাসার কথা উচ্চারিত হয়েছে বারংবার।

গ্রাম বাংলায় আজও হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণ তাদের ধর্মের মধ্যেই এক মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সংস্কৃতির মধ্যে বিশেষ কোন ফারাক উল্লেখযোগ্য নয়, ভাষার প্রয়োগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন থাকলেও মূল সংস্কৃতির খুব একটা বিশেষ তফাত ঘটেনি। পূজা পার্বণ আজও সকল ধর্মের মানুষ একত্রে পালন করে। এবং সকল ধর্মের মানুষ সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করে আসছে। বাবাঠাকুর, দক্ষিণ রায়, পঞ্চানন ঠাকুর, শীতলা, মনসা, সত্যনারায়ণ, সত্যপীর, গাজীপীর, ওলাই চণ্ডী, ওলাইবিবি, সাতবোন বিবি প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবী ও পীরের প্রতি সকল ধর্মের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন হয়।

ভারতে ইসলাম যুগ থেকেই সকল ধর্মের মানুষকে একত্রে শাসন করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বহু বাদশা ও সম্রাটগণ ভারতকে একত্রে শাসন করার স্বপ্নের মধ্যে ঐক্যর দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। সম্রাট আকবর যার সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক, যিনি ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও জাত-পাতের মানুষকে একত্রে শাসন করেছিলেন দীর্ঘদিন।

ইংরেজ আমলেও এই ঐক্যের চেষ্টা শুধু ইংরেজ শাসকবর্গই করেননি। স্বদেশের বহু রথী-মহারথীগণও করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়, গিরিশ চন্দ্র সেন প্রমুখ তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ভারত বিভেদের মধ্যে বিরাজ করেছে, গণঅভ্যুত্থান, বিদ্রোহ ও বহুমুখী আন্দোলন বিভেদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে তবুও সর্বসাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যের ভাব সদাই ছিল আজও আছে। ভারতবর্ষের মানুষ মূলত বিশ্বাস করে তাঁদের প্রধান এবং প্রথম শত্রু তারা, যারা তাঁদের উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক শোষণ আর শাসন চালায়। যার ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে বহু বড় বড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাত-পাতের লড়াই দানা বাঁধার চেষ্টা করলেও বেশিদূর এগোতে পারেনি। কারণ এখানকার মানুষ শোষণ যন্ত্রণাকে যেভাবে চেনে সেভাবে জাতি-বৈষম্যকে চেনে না।

তদুপরি, ভারতে বিভিন্ন ধর্ম শুধু যে মানুষকে বিভেদের মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছে তা নয়, তাঁদের মধ্যে ঐক্যের সুরও জাগিয়েছে।

ইসলাম ধর্ম শিখিয়েছে—ঈশ্বর জগতের পিতা আর জগতের সকল মানুষ একে অপরের ভাই, এই ধর্মে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। এর মতে সকলে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে খোদার নিকট প্রার্থনা করতে ও একসঙ্গে আহার করতে পারেন। খ্রীষ্টানগণও জাতিভেদ মানেন না। উপনিষদে বলা হয়েছে, সর্বদা সকলের হৃদয়েই ভগবান বিরাজ করেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অহংকে বলি দেবার জন্য বলেছেন, 'দে মা আমাকে অস্পৃশ্যদের সেবক করে দে, আমি যে দীনতমের চেয়েও দীন—এই বোধ আমায় জাগিয়ে দে মা। আমার অভিমান ভেঙে দে, সবার সঙ্গে আমাকে সমভূমি করে দে' সকলের সঙ্গে নিজেকে সমান করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ অস্পৃশ্যদের উচ্ছিষ্ট মুখে দিতেন। নর্দমা পরিস্কার করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ এক ধর্ম সভায় বলেছিলেন, 'হে ভারত ভুলিও না তোমার সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। ভুলিও না নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সর্দপে বল' আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই"।

আধুনিক কালের কবি সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণও জাত-পাত ও ধর্মের গোঁড়ামী থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তার কবিতায় লিখেছেন,

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে"

'অপমানিত' কবিতায় বলেছেন,

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমান হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তা'র 'জাতির পাঁতি' কবিতায় লিখেছেন :—

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।

তিনি পুনরায় লিখেছেন :

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর-বনেদী,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ,
দুনিয়া সবার জনম বেদী।

জাতিভেদ প্রথাকে ঘৃণা করে নজরুল ইসলাম লিখেছেন—

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবিস এতেই বুঝি জাতের জান,
তাই তো বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ, খান।"

আচার্য্য শহীদুল্লাহ বলেছেন—ধর্মের উদ্দেশ্য—ধার্মিক নিজে শান্তি পাবে আর পাবে তার হাতে সমস্ত দুনিয়া শান্তি। যা অশান্তি ঘটায়, তা ধর্ম নয়, পরম অধর্ম। তিনি আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন প্রেম এবং ভালবাসাই ধর্ম। মুর্খ জাতির কোনো ধর্ম নাই, কর্ম নাই, উদার শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের মিলন চাই। পুরুষের গানে নারীর ও সমান শিক্ষা ইত্যাদির কথা প্রকাশ্যেই বলতেন। তিনি মেয়েদের পুরুষদের সাথে খোলা আকাশের নীচে নামাজ পড়ার কথা বলেন।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও ভাষার মানুষের মধ্যে মূলত দুভাগে বিভক্ত হয়েছে শাসক আর শাসিত, উৎপীড়ক আর উৎপীড়িত, মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে। ধর্ম তাদের আলাদা করার চেষ্টা করলেও মূলত অর্থ নৈতিক কারণই মানুষকে তার চেতনাবোধের জায়গায় শ্রেণীর অবস্থানকে ঠাঁই দিয়েছে। এখানে মানুষের মধ্যে যত ঐক্য ও মিলন দেখা যায় তা কেবল মানুষরূপে। যদিও ধর্মেই বিভিন্ন বর্ণের,

জাতির কথা উল্লেখ আছে। কোন ধর্মই মানুষকে শ্রেণীরূপে চিহ্নিত করেনি। বরং সকল ধর্ম ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শ্রেণীর অবস্থানের কথা উল্লেখ করে গেছেন। হরিজন, দাস, শূদ্র, চণ্ডাল ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে মানুষ শব্দ কিংবা 'শোষিত মানুষ' বা 'অত্যাচারিত মানুষ' এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়নি। প্রকারান্তে বিদ্রোহী মানুষকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এক প্রকার মায়াকান্না গাওয়া হয়েছে। সর্ব ধর্ম এবং মানুষ এবং প্রেমই ধর্ম ইত্যাদি গালভরা কান্না শোনান হয়েছে। আবার অন্যদিকে দেখা যায় এখানকার মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে এক অদ্ভুত ধরণের মিলন

এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসিক, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক আপন আপন ধর্মের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে একত্রে বসবাস করছেন। আদিম জাতির নিজস্ব ধর্মমতও এখানে প্রচলিত আছে। অশোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও অপর ধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেননি। অনুরূপভাবে আকবর মুসলমান হয়েও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন।

অতি প্রাচীনকাল হতে আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হূণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি জাতি এই ভারতের মাটিতে এসে জনসমুদ্রের ভীড়ে নিজেদের হারিয়ে দিয়েছেন তাঁরা সকলেই আজ ভারতবাসী। এঁদের পৃথকভাবে চিনবার উপায় নেই। তথাপি জাতপ্রথা হিন্দু সমাজের 'ইস্পাত কাঠামো' বলে অভিহিত। এই প্রথা বেদের থেকেও পুরানো একথা বেদেও উল্লেখিত আছে।

অতীতে হিন্দুধর্মে সমস্ত হিন্দুর মধ্যে সাংস্কৃতিক একতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু জাত প্রথা সামাজিকভাবে হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান হারে গোষ্ঠী অথবা উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত করে ফেলেছিল। বিবাহ, বৃত্তি, ভোজন ইত্যাদি সবরকম মূলগত সামাজিক বিষয়ে প্রতিটি গোষ্ঠী অথবা উপগোষ্ঠী ছিল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জাতপ্রথা ছিল অগণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ। জাতসমূহ ক্রমপর্যায়ে বিন্যস্ত। নীচু জাতের চেয়ে উঁচু জাত ছিল উন্নত এবং উঁচু জাতের চেয়ে নীচু জাত ছিল নিম্নতর। কার কোন জাতে জন্ম হয়েছে

তাই নিয়ে বিচার হত তার মর্যাদা। জন্মসূত্রে মানুষকে যে মর্যাদা দেওয়া হত ধন বা মেধা দিয়ে, সে মর্যাদা অর্জন করা ছিল অসম্ভব। ফলে মানুষের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে ছিল এক বড় বাধা। এবং ধীরে ধীরে এই জাত প্রথাই অস্পৃশ্যতায় পরিণত হয় এবং এক বড় সমস্যার সৃষ্টি করে।

জাতের শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ যারা পিরামিডের সর্বোচ্চ শিখায় আর শূদ্র সর্বনিম্ন এবং পিরামিডের পদতলে। সমস্ত ক্ষমতা, অর্থ, ঐশ্বর্য্য, ভোগ ইত্যাদির মালিক ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং সব কিছু থেকে বঞ্চিত ছিল শূদ্র। তারা নিপীড়িত, অচ্ছ্যুত এবং বঞ্চিত। সুতরাং প্রাচীনকালের সমাজ থেকেই শুরু হয়েছে জাত প্রথা। জাত প্রথা বিবাহ, বৃত্তি, অন্যান্যদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ মানুষের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রণ করত, জাতের বিধিনিষেধ ধর্মানুমোদিত ছিল হিন্দু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা ও সেই সঙ্গে দণ্ডবিধানে জাতের নিজস্ব ক্ষমতা—এইসব কারণের দরুণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকত না। ব্যক্তি তার বৃত্তি নির্বাচন করতে পারত না, যাকে যে ইচ্ছে করত, তাকে বিয়ে করতে পারত না। যে কোনো লোকের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে পারত না। উপরন্তু সূক্ষ্মভাবে স্তর বিভক্ত জাত ক্রমপর্যায়ে যার যে পর্যায়ে জন্ম হয়েছে সেই পর্যায় অনুসারেই তার সামাজিক মর্যাদা এবং রাষ্ট্রের আইনের চোখে তার স্থান নির্ধারিত হত। আইন সকলের প্রতি সমভাবে প্রযুক্ত হত না, জাত অনুসারে আইন প্রয়োগে পার্থক্য করা হত।

এই জাত প্রথা মধ্যযুগে আরও কঠোর হতে লাগলে মানুষ বিদ্রোহে ফেটে পড়ত এবং নিজেদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় জাত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। যা কখনও শ্রেণী সংগ্রামের রূপও ধারণ করত। এবং একই সময় সমাজ সংস্কারকগণ (উদারপন্থী) এই সামাজিক বৈষম্য ও কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে শুরু করেন। বিভিন্ন সংস্কারক গোষ্ঠীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জাতকে বিরোধিতা করেন। এবং বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা কৃতকার্য হন।

পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার জাত প্রথাকে দুর্বল করে দেয়।

ভারতীয় জনসমাজে প্রাগ্রসর শক্তিসমূহ জাত, অশিক্ষা, অস্পৃশ্যদের অমর্যাদার বিরুদ্ধে এবং আর যা কিছু মানুষকে পশ্চাদ্‌বর্তী করে রাখে সেই সবকিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রামেই অগ্রণী হয়েছিল। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও তার চিরায়ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যখন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছিল, তখন জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ সার্বিক সমর্থনপুষ্ট ভারতীয় জাতীয়তা-বাদী আন্দোলন, জাত, বর্ণ অথবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন সমানাধিকারের পুরোপুরি গণতান্ত্রিক কার্যক্রম প্রচার করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধা বিলোপ করা, সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার, সর্বজনীন অবাধ বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, বাক্‌-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, সমিতি ও সংগঠন করার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা—রজনীপাম্প দত্ত তার পুস্তকে উল্লেখ করেন। তবে জাত প্রথা ব্যবস্থা ভারতবর্ষ থেকে ধীরে ধীরে বিলোপ হয়ে শ্রেণী সংগ্রামে মানুষ লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যা সমাজ পরিবর্তনের একটা বড় ইচ্ছা।

গ্রন্থ সূত্র ঃ—

১। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, এ. আর. দেশাই
২। আন্তর্জাতিক ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতা ডঃ কালীপদ মালাকার,
৩। বেদ, উপনিষদ ও মনুসংহিতা।

উন্নয়ন ভাবনা ও পরিকল্পনাধীন ভারত

ব্যক্তির ভাবনা :

ভারতবর্ষের ইতিহাসের আদিমকাল থেকে আলোচনা করলে একটা পরিষ্কার ধারণা হয় যে ভারতবর্ষের জনগণের জন্য "উন্নয়ন' ধারণা কখনই কোন কালে পরিপূর্ণ ছিল না। প্রাচীন যুগ বাদ দিলে মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তই ভাবতবর্ষ ছিল বিদেশী শাসনে বদ্ধ। ভারতবর্ষের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি কিংবা কৃষ্টি, ধর্ম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বারংবার লোপ ও ধ্বংস হয়ে পড়েছিল। জনগণেব জন্য উন্নয়ন ভাবনা মোগল ও ইংরেজ যুগে কেউ কেউ করলেও তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বা করার কোন প্রকার ইচ্ছাও ছিল না। যদিও সমাজচিন্তাবিদগণ তাঁদের মতামত ধারাবাহিকভাবে ব্যক্ত করেছেন। এবং আধুকিকালে ভারতবর্ষেব উন্নয়নের জন্য বিশেষ কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিকগণেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে যদিও এদের মধ্যেও আবার অনেকে দর্শননিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক এবং অনেকে ফলিত সমাজতাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব আছেন। তদুপরি ভাবতের উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলি আজও অব্যাহত রয়েছে।

তথাপি আমরা কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির মতামত নিয়ে আলোচনা কবব :

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এমনই একজন বাক্তিত্ব যার বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সমাজ, দর্শন, ধর্ম ও অর্থনীতির ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক পর্যালোচনা করেছেন। ভাবতবর্ষের দারিদ্র, শোষণ এবং আচারের নির্মম সমাজ চিত্র দেখে তিনি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া ভারতবর্ষের মুক্তি নেই একথা তিনি বলেন। সে কারণেই তিনি পুনরায় মার্কসায় দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষের পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে বলেন, "যতক্ষণ বিদেশী শত্রু মাথার উপরে রহিয়াছে ততক্ষণ বিভিন্ন শ্রেণাকে একত্রভাবে কর্ম করিয়া রাজনীতিক বিপ্লব সংঘঠিত করিতে হইবে"।....ভারতের উন্নতি বলতে ভূপেন্দ্রনাথ দরিদ্র জনগণের

উন্নতির কথাই বলেছেন। অর্থনৈতিক বিকাশ ছাড়া কোন প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়,—এটাই ছিল তার অভিমত। এবং তিনি মনে করতেন একমাত্র ভূমিই সেই উপাদান যার সমস্যা মিটলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আমাদের তরুণদের নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে; নূতন চরিত্র গঠন করিতে হইবে; নূতন ভাবে রাজনীতি-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি তত্ত্বের অনুশীলন করিতে হইবে।" তিনি আরও বলেন, "বর্ত্তমানের আদর্শ হইল কোটি কোটি, নিরক্ষর, নিষ্পেষিত দরিদ্র জনগণকে তাহাদের মুক্তির কথা বলা, মানবিক অধিকার দান করা ও তজ্জন্য কার্য করা। কিন্তু তবু রাজনৈতিক সাম্য দিলেই যথার্থ মুক্তি দেওয়া হয় না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য যখন পাওয়া যায় তখনই প্রকৃত স্বরাজ আসে"। এমনকি তিনি 'জাতীয়তাবাদকে' এক বিদেশী ধারণা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি আর্থ-সামাজিক, ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বিশ্বাস করতেন কারণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতির পরিবর্তন রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী একথা বুঝতে তখনকার দিনে ভারতীয়দের অসুবিধা হয়নি।

বিনয় কুমার সরকার: একজন সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দুনিয়ার উর্বর ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিকাশ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরকার বলেন, (১) ভূমি সংস্কার, (২) উন্নত মানের কৃষি, (৩) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, (৪) কুটির শিল্প এবং (৫) মূলধনের বিন্যাস প্রয়োজন। দারিদ্র সম্পর্কে অধ্যাপক সরকারের বিশ্লেষণ হল, আমরা জানি যে, আমাদের দেশে অভাব বা দুঃখদারিদ্র উপস্থিত হলে চট্ করে তাকে দুর্ভিক্ষ বলা চলে না, এমনকি 'টানাটানিও' বলা যায় না। তাঁর ভাষায় সমাজসেবা রকমারি। সমাজের কাজ, সমাজসেবা, সাহায্যের কার্য, উদ্ধার সাধন, দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দারিদ্র নিবারণ, সঙ্কটত্রাণ ইত্যাদির মূর্তি, গড়ন বা রূপ নানাবিধ। সমাজসেবা বা দারিদ্র নিয়ন্ত্রণ হাজারো রকমের মূর্তি বিশিষ্ট। জার্মান ও ভারতের 'সমাজসেবার' প্রকৃতি তুলনা করে অধ্যাপক সরকার মন্তব্য করেছেন, "জার্মান জাতি

প্রত্যেক বৎসর শীতের ছয় মাস (অক্টোবর-মার্চ) দুঃখ কষ্ট এবং দারিদ্র পীড়িত জনগণের সেবায় কম্‌সে-কম সাইত্রিশ কোটি টাকা খরচ করে। এই টাকা ভারতের কেন্দ্রীয় গর্ভনমেণ্টের মোট ব্যয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ।" ভারতবর্ষের দারিদ্র দূরীকরণ পদ্ধতির কথা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বলেন, 'ভারতবর্ষ' সমাজবীমা বা 'দারিদ্র কর' কোন কিছুরই ধার ধারে না। আমাদের পরিচয় কেবলমাত্র দানখয়রাত বা পরোপকারের মত মান্ধাতার আমলের দবিদ্রসেবার সঙ্গে। এই শ্রেণীর দরিদ্র সেবায় নিয়মশৃঙ্খলা বা কর্মপদ্ধতির প্রায়ই অভাব দেখা যায়।" শুধু তাই নয় তিনি মনে করেন উন্নতি সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। উন্নতির নিদর্শণগুলি সবই মজুদ অথচ বিকাশের অসাম্যও রয়েছে। অধ্যাপক সরকার ভারতের মতন দেশে যেখানে বহু সম্প্রদায়, শ্রেণী ও জাতির মানুষ বসবাস করেন সেখানকার উন্নয়ন ধারা কেমন হবে তাও উল্লেখ করে বল্লেন, "যে কোন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তর শ্রেণী ও দলগুলি অনেকটা তরল পদার্থের মতো এবং সদা সর্বদাই এইগুলি বিভিন্ন রক্তগত জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানসেবীদের এই কথাটাও উপলব্ধি করতে হবে প্রত্যেক দেশ,ধর্ম, রক্তগত জাতি, শ্রেণী ও সামাজিক স্তরে বিচিত্র ও বহুবিধ শক্তি বা কারণের প্রভাবে ভাঙ্গন গড়ন সাধিত হয়ে থাকে। সমষ্টিগত জীবনের এই গতিধর্মটাও তলিয়ে দেখার দরকার। নয়া নয়া জনপদ, নয়া নয়া রক্ত বা হাড়মাসের জাতি, নয়া নয়া শ্রেণী ও নয়া নয়া শক্তি বা কারণের উর্দ্ধ মাত্রা নজরে না রাখলে বিপ্লবের ভাঙ্গন গড়নের অথবা উন্নতি—অবনতির মূর্তি হৃদয়ঙ্গম হতে পারে না। আসল কথা সব সময় নজর রাখতে হবে বৈচিত্র্যের দিকে—বহুত্বের দিকে।"

ধূর্জটীপ্রসাদ মুখার্জীঃ ভারতবর্ষের আর একজন অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রবক্তার মতে, "ঐতিহ্যের পরিবর্তনের বাহ্যিক শক্তি হল অর্থনীতি"। কিন্তু "যে ভাবে অর্থনৈতিক শক্তি কাজ করে তা সেই যান্ত্রিক শক্তি নয় যা জড় পদার্থকে সচল করাবে"।

তিনি মনে করতেন, অর্থনৈতিক শক্তি যদি শক্তিশালী না হয় (এবং উৎপাদনের উপায় পরিবর্তনের ফলেই তা সম্ভব) তা হলে চিরায়ত প্রথা মানিয়ে নেবার নীতি সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে।

সখারাম গণেশ দেউস্কর : মহারাষ্ট্রের দেউস্কর বংশের আদি নিবাসী হলেও তার পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদে জন্ম ও কর্মজীবন কেটেছে। আপোষহীন সংগ্রামী সখারাম ভারতের সমাজ অর্থনীতি ও ইতিহাস প্রসঙ্গে বহু আলোচনা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হলে দেশীয় পণ্য জাতের ব্যবহারে দৃঢ় সংকল্প হওয়া যেমন আবশ্যক, তেমন রাজশক্তির প্রতিকূলতা নিবারণের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোত দিন দিন প্রবল করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ প্রজার দ্বারা নিবারণ না হলে রাজার যথেচ্ছাচার বা যথেচ্ছ শক্তি প্রসারণ করবার অধিকার আছে—এটাই পাশ্চাত্য নরপতিদের ধারণা।.... আমাদের আন্দোলন ভিক্ষুকের আবেদন মাত্র। আমাদের দাতার করুণার উপর একান্তই নির্ভর করে বসে থাকতে হয়।

সখারাম ভারতবর্ষের দারিদ্রের প্রধান কারণ হিসাবে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা অত্যাধিক কর আদায় করার চেষ্টা দায়ী করেন। তাঁর মতে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ রাজ পুরুষরা এদেশের কৃষি শিল্পজীবিদের যে নির্মমভাবে লুঠ করেছিলেন তাতে ভারতবাসীর অধিকাংশ সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হয়ে পড়ে—অতিরিক্ত কর দিয়ে কৃষকেরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, শিল্পীরা বাণিজ্য সংগ্রামে হেরে গিয়ে কৃষি কাজ করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও তিনি ভারতের দারিদ্রের কারণ হিসাবে অধিক প্রযুক্তির আমদানি ও ব্যবহারকেও দোষ দেন। তিনি উন্নয়নের জন্য সর্বপরি রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন।

উল্লেখিত কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিকগণের মতামত আলোচনা করে পরিস্কার ধারণা হয় যে ভারতবর্ষের দারিদ্র দূরীকরণ তথা উন্নয়ন যদি আবশ্যক হয় তাহলে শুধুমাত্র কল্যাণ কার্য কিংবা বদান্যতা বা দানশীলতার মাধ্যমে সম্ভব নয় বরং প্রয়োজন দেশের গোটা সমাজ ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। যা সম্ভব কেবল গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলনের মাধ্যমেই। দেশের সর্বপরি জনসাধারণের মধ্যে গণচেতনারও প্রয়োজন আছে তবেই উন্নয়ন কার্য সমাপ্ত হবে।

বে-সরকারী সংগঠনের ভাবনা :

উন্নয়নের ভাবনায় বে-সরকারী বহু সেচ্ছাসেবী সংগঠন সামিল হয়েছেন। তারাও যুগ যুগ ধরে সমাজকল্যাণ কার্য চালিয়ে আসছেন। পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে উন্নযন ভাবনারও কিছুটা পরিবর্তন হযেছে তারই কিছু প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করলাম। যদিও এই আলোচনা দেশব্যাপী দারিদ্র দূরীকরণেব সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখে না তবুও আমার মনে হয় ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে সেচ্ছাসেবী সংগঠনের ক্ষুদ্র মানবিক বিকাশ প্রয়াসের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

উন্নয়ন কার্যের ধারা (উদ্দেশ্য) :

উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ—পিছিয়ে পড়া মানুষদের (৭০ ভাগেরও বেশী) আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসূচী অবশ্যই গ্রহণ করা। কর্মসূচী অবশ্যই স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী হওয়া উচিৎ। সাধারণতঃ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা সমুহদের স্বল্পমেয়াদী খয়রাতিমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করতে দেখা যায়। যা উন্নয়নের বিপরীতমুখী এবং মূল বাঁধাস্বরূপ। অতএব খুব সচেতনতার সঙ্গে খুঁটিনাটি বিচার ক'রে প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণ করা দরকার। যেকোন কর্মসূচীই 'উন্নযন কর্মসূচী নয়' একথা স্মরণ রাখা ভাল। তবে যেকোন কর্মসূচীকেই উন্নয়নমুখী করা যায় যদি তার সঠিক মূল্যায়ণ ও প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির দ্বারা রূপায়ণ করা যায়।

সরকারী সকল স্কীম (প্রকল্প) বা গতানুগতিক প্রকল্পগু'লিরও মোড় ঘোরানো যায়। আর উচিৎও কারণ বদান্যতা বা খয়রাতি মানুষকে দিন দিন দারিদ্রের চরম অবস্থার দিকে আরও বেশী ক'রে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়া যদি গণসংগঠনগুলি স্কীম বা প্রকল্পমুখী হয়ে ওঠে তাহলে উন্নয়মের সিঁড়িতে পা রাখা সম্ভব নয়। সকল সময় প্রকল্পের বাস্তবায়িত করাতেই ব্যস্ত থাকবে, আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ—সাধারণ মানুষকে তার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা কিংবা স্ব-নির্ভর হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা যাবে না।

এছাড়া আমরা সকলেই জানি আমাদের সম্পদ (অর্থ) সীমিত আমরা প্রতিটি মানুষের জন্য ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এমন কিছুই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারব না, আর সম্ভবও নয়। সুতরাং কমিউনিটি (গোষ্ঠী) ভিত্তিক প্রকল্পগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। যেমন :—

ক) সচেতনতা কর্মসূচী :

যে কোন প্রকল্প রূপায়ণের পূর্বে মানুষকে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানো এবং এক জনমুখী প্রক্রিয়া শুরু করা দরকার যার দ্বারা সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে প্রকল্প রূপায়ণে। এবং নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনও হতে পারে।

১) আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে দলগত বা শ্রেণীগতভাবে সে যে একজন শোষিত বর্ণের মানুষ এবং সমস্ত অধিকার থেকে সে বঞ্চিত একথা যেন সে উপলব্ধি করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত যাতে সে তার নিজের অধিকারের লড়াইয়ে বলিষ্ঠ সৈনিক হতে পারে তার চেষ্টা চালানো।

২) নানান সমস্যাকে কেন্দ্র করে জনসভা, সাধারণ সভা, প্রদর্শনী পদযাত্রা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং উদ্যোগী হয়ে বেশি বেশি সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণ করানো। সচেতনতা বিষয়গুলির মধ্যে হতে পারে মদ্যপান বা নেশা-বিরোধী, নিরক্ষরতা, বধূ হত্যা ও নির্যাতন মহিলা সম্পর্কে সচেতনতা স্বাস্থ্য বিষয়ক, কাজের অধিকার, মজুরী বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি উৎপাদনমুখী করে তোলা ইত্যাদি।

৩) সাধারণ মানুষের শ্রমশক্তি সম্পর্কে তাকে সচেতন করা এবং তার নিজস্ব সম্পদের বিকাশ কিভাবে ঘটতে পারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করা সেই সাথে কি ধরণের প্রকল্প নেওয়া উচিৎ কিংবা প্রকল্পগুলি কিভাবে প্রয়োগ করলে জনমুখী হয়ে উঠবে সে চেষ্টা করা।

৪) এই কর্মসূচীগুলির মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এলাকার সাধারণ মানুষদের মধ্যে নেতৃত্ব গঠন বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার নেতা (গোষ্ঠী-মনোভাবাপন্ন) তৈরী করা এবং সম্ভাব্য যুবক-যুবতীদের মধ্যে কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার সাথে সাথে আর্থিক সহায়তা করে তাদের স্ব-নির্ভর করে তোলা।

খ) আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচী ঃ

প্রাথমিক কাজ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তার পরের অংশরূপে আর্থিক প্রকল্প রূপায়ণ করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই সেই প্রকল্প চালু করার পূর্বে কারিগরী ও পরিচালন বিদ্যা এবং বাজার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া উচিৎ। সেই সাথে আর্থিক সহায়তা ঋণ-রূপে গ্রহণ করা ও পরিশোধ করার মানসিকতা গড়ে তোলা দরকার।

১। আর্থিক প্রকল্পগুলির মধ্যে মহিলাদের জন্য উপযোগী প্রকল্পগুলির উপর জোর দিতে হবে। মহিলা সমিতির মাধ্যমে নানাবিধ কুটির শিল্প বা কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে যেমন সাবান তৈরী, জামা-কাপড় তৈরী, সূচি শিল্প গঠন, ছাপাখানা, বই বাঁধাই, তাঁত ইত্যাদি। এছাড়া মাছ চাষ, পোলট্রি, পিগারী, বড়ি তৈরী, বাগান চাষ, নার্শারী ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক কর্মসূচী।

২। আর্থিক প্রকল্প শুরু করার আগে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর মধ্যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা দরকার। যে সকল ব্যক্তি সঞ্চয় কববেন নিয়মিত শুধু তারাই প্রকল্পের ব্যবহারের অধিকারী হবেন। (ঋণ পাবার উপযুক্ত) এছাড়া ঋণ পাবার পরও সঞ্চয় চালাতে হবে।

৩। আগেই আলোচিত হয়েছে প্রকল্পগুলি হতে হবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে উৎপাদনমুখী। যেহেতু বেশির ভাগ সংগঠনগুলিই গ্রামাঞ্চলে কাজ করছেন প্রকল্পগুলি সেই কারণে কৃষিভিত্তিক হওয়া উচিৎ।

গ) সেবা কর্মসূচী (সার্ভিস) প্রকল্প ঃ

বেশির ভাগ সংগঠনগুলিই এই ধরণের কাজের সাথে যুক্ত। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাৎক্ষণিক কিছু গরীব মানুষকে 'পাইয়ে' দেওয়া।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাতে তারা নিজের চিন্তা-ভাবনার মূল্যায়ণ করে স্বনির্ভর হতে পারে সেদিকে ঝোঁক থাকে না। যতদিন 'পাওয়া' যাবে ততদিনই দারিদ্র্যের আপাতত ক্ষুধা মিটবে তারপর যে কে সেই।

যেমন ধরা যাক, অনেক প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয় কেবলমাত্র ঔষধ বিতরণের জন্য কিংবা শীতের সময় শীতবস্ত্র ও অন্যান্য সময় নানাবিধ পোষাক, ব্যবহারিক জিনিসপত্র, আর্থিক সহায়তা দানস্বরূপ ইত্যাদি যার মূল দিকটাই হচ্ছে খয়রাতি। মানুষের প্রয়োজন আছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান কিন্তু মেটানোর উপায় খয়রাতি নয়। স্কুল নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, নলকূপ খনন, শৌচালয় নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ এই সকল প্রকল্প শুধুমাত্র যদি রূপায়ণ করা হয় মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়াই তাহলে এর সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। অথচ এই সকল চাহিদামুখী প্রকল্পগুলি রূপায়ণের পূর্বে যদি আলোচনা করা যায় এবং যারা ভাগীদার তাদের মধ্যে যদি উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং 'আমাকেই প্রকল্প রূপ দিতে হবে' এই ভাবনা তৈরী করা যায় তাহলে সার্ভিস প্রোগ্রামগুলি উন্নয়নমুখী করে তোলা যায়। যেকোন সার্ভিস প্রোগ্রাম স্বল্পমেয়াদী কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রক্রিয়াগুলির যদি পরিবর্তন হয় তাহলে তা উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে।

ঘ) মানবিক বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার মানবিক প্রশিক্ষণ। এলাকার ব্যাপক মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ চালু রাখার প্রয়োজন আছে, এলাকা উন্নয়নের সাথে সাথে দেশ গঠনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে হবে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে কর্মীদের মধ্যে। দারিদ্র্য নির্মূলের কারণগুলি খুঁজে বের করতে হবে। শোষণ আর শাসন নীতির অবসানের জন্য কর্মীদের মধ্যে যেমন বিশ্লেষণী মনোভাব তেমনি মূল্যবোধও গড়ে তোলা দরকার হবে। পৃথিবীর পরিবর্তন, সমাজের অগ্রগতি কিভাবে ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। অর্থাৎ কর্মীমণ্ডলীদের যত বেশী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করা যাবে তত বেশীই উন্নয়নের পথ সহজ হবে।

ঙ) পরিচালন বিষয় :

যে কোন সংগঠন পরিচালনার জন্য বিশেষ মত, দল এবং প্রেরণার দরকার। অর্থাৎ সঠিক উদ্দেশ্য ও ধারণা নির্দিষ্ট কর্মী ও তার অংশগ্রহণ। মোটামুটিভাবে বলা যায় উন্নয়নমূলক সংগঠনগুলির মধ্যে এক বিশেষ ধরণের 'গোষ্ঠী' বাতাস বইতে থাকে যেখানে 'একলা' চলার নীতি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। যদিও একজনই হয়তো অনুপ্রেরণা যোগায় আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু মূল শক্তি হল সমস্ত কর্মীবাহিনী এবং দরদী ব্যক্তি যারা সংগঠনকে অন্য ধাঁচে ফেলতে চায়। সবাই মিলে জেতার ব্যাপারই হচ্ছে উন্নয়নের ঘোড়া কর্মীদের সঙ্গে ঘন সম্পর্ক স্থাপন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা এবং মাঠস্তরের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সু-সম্পর্ক স্থাপন করে অংশগ্রহণ করানো। এছাড়া যে সকল বিধিবদ্ধ কাজ থাকে যেমন খাতা লেখা, হিসাব রাখা, রিপোর্ট লেখা বা রিপোর্ট পাঠানো সময়মতন এ সকল কাজেরও গুরুত্ব একই রকম।

তিনমাস অন্তর কর্মীদের সাথে কাজের মূল্যায়ণ করা এবং সর্বোপরি বছরে একবার এবং তিন বছরে একবার অবশ্যই বন্ধু-সংগঠন কিংবা অপরিচিত সংগঠনের মাধ্যমে মূল্যায়ণ হওয়ার প্রয়োজন আছে।

মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ :

মানুষ সামাজিক জীব। তাই সমাজের যে কোন কাজ মানুষকে নিয়েই করতে হবে ছোট বড় যাই হোক না কেন তারা মানুষ। মানুষকে জানা বা চেনার কাজ হল সব থেকে কঠিন কাজ। সব থেকে সহজ কাজ হল বিকাশের কাজ। হিসাবপত্র করার জন্য কমার্স পড়লে হবে। ডাক্তার হবার জন্য ডাক্তারী পড়লে হবে, শিক্ষক হতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিলে হবে, কিন্তু মানুষকে চেনা বা জানা বড় কঠিন কাজ। কারণ এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রম নেই।

মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিছু মানুষ পরিবারের মধ্যে ঘুরছে বা চিন্তা করছে। আবার কিছু মানুষ পরিবার ছাড়াও সমাজের কথা চিন্তা করছে। আবার কিছু মানুষ পরিবার, সমাজ ছাড়াও রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করছে। আবার কিছু মানুষ পরিবার,

সমাজ, রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর কথা ভাবছে। এই যে গণ্ডিটা এটা চলমান গণ্ডি। সব সময় ঘুরছে। কোন সময় বসে নেই। সাইকেল বা ঘড়ির চাকার মত প্রতিনিয়ত ঘুরছে। একটা মানুষকে পৃথিবী পরিক্রমা করানো যায় যদি তার আগ্রহ বা উদ্দেশ্য থাকে। যদি আপনি গ্রামের মধ্যে কাজ করেন তাহলে জ্ঞানের পরিধি গ্রামের মধ্যে থাকবে আবার যদি ভাবেন যে একটা কাজ এমন করব যেটা পৃথিবীব্যাপী হবে তাহলে জ্ঞানের পরিধির বৃদ্ধি হবে। মানব সমাজের ইতিহাস পড়লে বোঝা যায় মানুষ নিজে নিজে বা একা একা কিছু করেনি। সমাজে কারো না কারোর উপর নির্ভর করে বা সাহায্য নিয়ে সে এগিয়েছে। কেউ স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না। কোন মানুষকে প্রথমেই আপনার সাথে আসতে বললে সে আসবে না। আপনার নিজের সাথে অপরকে যুক্ত করার আগে পরিক্রমার পরিধিটা ঠিক করতে হবে। পৃথিবী ঘুরবেন না শুধু গ্রাম ঘুরবেন। মানুষের সঙ্গে দু'চার'দিন মেলামেশা করার পর একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। পরে দ্বিতীয় ধাপে যাওয়ার জন্যে তাকে ডাকলে সে আসবে। কারণ তার সঙ্গে আপনার পরিচিতি হয়েছে। আপনাকে সে চিনেছে। আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রথম ধাপ হল সম্পর্ক স্থাপন। সাধারণতঃ সমবয়সীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা বেশ সোজা। আবার বড়দের সঙ্গে ছোটদেরও একটা সম্পর্ক সহজেই গড়ে তোলা যায়। অবশ্য কার সঙ্গে কতটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে সেটা নির্ভর করছে উদ্দেশ্যের উপর। আপনার টারগেট যদি থাকে পৃথিবী পরিক্রমা করা, তাহলে সেভাবে করবেন। যদি মনে করেন সমাজকে পরিক্রমা করবেন তাহলে সেরকম হবে। উদাহরণ স্বরূপ ২৫ বছরের এক ছেলে কৃষি বিষয়ক ট্রেনিং নিয়েছেন বা কৃষি বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন। তার কাছে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আছে। কোন বৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে যদি তথ্য বিনিময় করতে হয় তাহলে বৃদ্ধের সাথে সমবয়সী আচরণ করলে চলবেনা। তার কারণ, তিনি এতদিন পর্যন্ত যা শিখিছেন বা করেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞান দিতে চাইলে তিনি নেবেন না। তাই প্রথম কাজ হবে তাঁকে ক) সম্মান করা।

খ) তাব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব বা স্বীকৃতি দেওয়া এবং। গ) শ্রোতার ভূমিকা পালন করা। মানুষের সঙ্গে মিশতে গেলে আপনার এই গুণগুলি থাকা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে আপনার রুচিবোধ থাকা দরকার। অর্থাৎ আপনার উপস্থাপনা যেন তাদের কাছে রুচিসম্মত হয়। তাদের সামনে গিয়ে আপনি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলতে লাগলেন যে আপনারা বসুন আপনাদের কিছু বলব তাহলে কিন্তু তারা সন্তুষ্ট হবেন না। আপনার উদ্দেশ্যের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করতে হবে পরোক্ষভাবে। বিষয়ের যথাযথ এবং সঠিক উপস্থাপনা এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার জন্য যথার্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের প্রযোজন। কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে হবে। শুধুমাত্র কাজ করলেই চলবেনা। কাজ করার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। কাজের মধ্য দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে

কাজ করতে হবে বলেই কাজ করা'—এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে পড়বে। কিন্তু কোন জিনিসকে বিকশিত করার জন্য কাজ করলে কাজের মধ্যে অনেক নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যায় কাজকর্মে হতাশার মনোভাব থাকে না। জ্ঞান ও প্রযুক্তির যৌথ উপাদানেই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। কাজের মধ্য দিযে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জনই যথেষ্ট নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা যে কোন ক্ষেত্রের কর্মীর পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ডাক্তার ডাক্তারী পাশ করার পর চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য বা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাকে ছয় মাস বা এক বছর অন্য বড় ডাক্তারের সাথে কাজ করতে হয়। তবেই তার অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার বিকাশ ঘটে। তাই সমাজকর্মীদেরও মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, মানুষকে বুঝতে হবে, মানুষকে জানতে হবে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে অনুরূপ ভাবে অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটাতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে না পারলে, অভিজ্ঞতার স্তরকে উন্নত পর্যায়ে পৌছে দিতে না পারলে, কোন

বৃত্তিতে (Profession) স্বাধীন ভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা যাবে না। সব সময় আজ্ঞাবাহী কর্মী হিসেবে কাজ করে যেতে হবে। সমাজ কর্মীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভাল বক্তা, ভাল গায়ক, ভাল অভিনেতা—প্রভৃতির বড় হবার পেছনে কাজ করেছে তাদের নিজস্ব বিষযের যথাযথ উপস্থাপনা। তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব বিষয়ের খুব ভাল উপস্থাপক। সুতরাং সমাজকর্মীদের ক্ষেত্রেও মানুষের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক তৈরী করতে হলে ভাল উপস্থাপক হতে হবে। সুবক্তা হতে হবে যেমন ভাল শ্রোতা হওয়া প্রয়োজন তেমনি ভাল কর্মী হতে হলে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়া জরুরী।

ব্যক্তিগত দক্ষতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার বিকাশেরও প্রয়োজন আছে। ধূমপান করা শিখেছি কিন্তু কেন ধূমপান করব বা কি প্রয়োজন মিটবে সেটা যদি বোঝার চেষ্টা না করি তাহলে শুধুমাত্র ধূমপান করতে হবে, তাই করছি। দেখতে হবে আমি যা খেয়েছি তার পাচন শক্তি আছে কিনা। নইলে বদহজম হবে। সেরকম আমার যা ক্ষমতা আমি সেভাবে শিখব। একেবারে অনেক বেশী শিখে পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করলে সেটা বদহজম হবে। অর্থাৎ আমার ধরে রাখার ক্ষমতা যতটা সেরকম ভাবেই জানব। যে কাজ আমরা করতে যাব সে কাজটা সম্বন্ধে আমার ততটাই জানা দরকার যতটা আমি ধরে রাখতে পারব। কিন্তু নূনতম ধারণা আমাকে রাখতেই হবে। তার জন্য আমাকে প্রয়োজন মাফিক সব কিছু জানতে হবে। যতটুকু জানার দরকার সেটুকু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মৌলিক ধারণা না থাকলে সংগঠন করা যায় না। আমাদের যতটুকু পরিধি ততটুকু অবশ্যই জানতে হবে। কারণ আমাদের অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। আমরা মনে করি, গ্রামে যারা থাকেন তাদের মধ্যে এমন কোন কোন লোক থাকেন যে অনেক কিছু জানেন এবং হয়তঃ সে এমন একটা প্রশ্ন করলেন যার উত্তর আপনার জানা নেই অথচ, উত্তর দিতে হবে। এখানে আপনার চালাকি ধরা পড়ে যাবে এবং সঠিক উত্তর দিতে না পারলে তার কাছে হেয় হয়ে যাবেন। তাই যে ব্যাপারে আপনাকে অন্যদের সাথে

আলোচনায় বসতে হবে সে ব্যাপারে আগে থেকে কিছু জেনে রাখা প্রয়োজন। যদি আপনি সুন্দরবন সম্পর্কে কাজ করেন তাহলে সুন্দরবন সম্পর্কে আপনার সাধারণ ধারণা থাকা দরকার। আপনি যে সুন্দরবন জানেন সেটা বললে যথেষ্ট নয়, আপনাকে সুন্দরবনের কয়েকটা দ্বীপের নাম উল্লেখ করতে হবে। সুন্দরবনের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে আপনাকে অবহিত হতে হবে। ওখানকার কত লোক নিরক্ষর, তাদের জীবনযাত্রার মান কি ধরণের সে বিষয়েও ধারণা থাকা দরকার। সুতরাং আপনার কাছে যদি তথ্য বা সংবাদ না থাকে তাহলে আপনি সংগঠক হতে পারবেন না। যে কোন সংগঠনকে প্রয়োজন অনুসারে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং সরবরাহ করতে হবে। আপনি গ্রামে গিয়ে বললেন আপনার গ্রামে জলের সমস্যা প্রচুর কারণ আপনি জল পাননি কিন্তু যখন কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন বলল না না আমাদের গ্রামে ৫টা কল আছে। আপনি সঠিক তথ্য না জেনে মন্তব্য করে ফেলছেন। তাই সমাজকর্মীদের তথ্য সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল হতে হবে। অর্থাৎ সমাজকর্মীদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধশালী হওয়া চাই। যত বেশী জ্ঞান আপনার মধ্যে থাকবে তত বেশী আপনার বক্তব্য ভাল হবে এবং ভাল বক্তা হবেন এবং অনেকক্ষণ ধরে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। আপনি মনে করছেন আপনি একজন বা দুজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় করছেন। কিন্তু তা নয়—অনেক লোক আপনাকে লক্ষ্য করছে বা দেখছে। সুতরাং আপনাকে জানতে হবে অনেক লোকের মাঝে আপনি যাচ্ছেন। সেভাবে আপনাকে প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হবে। কোন লোকের সাথে মিশবেন বা কোন লোকের সাথে গল্প করবেন সেটা আপনাকে আগে পরিকল্পনা করে নিতে হবে। গ্রামে গেলেই যে গ্রাম সেবিকা বা গ্রাম সেবক হয়ে যাবেন তা নয়। আমাদের গ্রামে কাজ করার আগে গ্রাম সম্বন্ধে বাহ্যিক ধারণা থাকা দরকার। গ্রামে যে কাজই করি না কেন আগে গ্রামটা পরিক্রমা করতে হবে। একজন ডাকাত গ্রামে ডাকাতি করলে সে গ্রামটা পরিক্রমা করে নেয়। কোথায় রাস্তা, কোন বাড়িতে ডাকাতি করবে তার পালাবার পথ কি প্রভৃতি

বিষয় সে আগে জেনে নেয়। একটা গ্রামেব প্রধান সড়ক কোনটা, ছোট গলি কোনটা সেটা জানতে হবে। নইলে গ্রামে গিয়ে গলিতে ঢুকে কারোর বাড়ি ঢুকে যাবেন। সুতরাং আপনাকে আগে জানতে হবে তবে কাজ করতে হবে। গ্রামে কে মাতাল কে দস্যু সেটা আপনাকে চিহ্নিত করতে হবে। তবেই না আপনি সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারবেন। একটা গ্রামে কাজ করতে হলে আপনাকে জানতে হবে সে গ্রামের মানুষকে। পঞ্চাযেত কিভাবে গঠিত হয়। পঞ্চায়েতের কাজ কি সে সমস্ত বিষয় আপনাব জানা একান্ত দরকার। কোন কিছু না জানলে কারোর হাত ধরে আপনাকে যেতে হবে। সব সময় আপনাকে পরনির্ভর হতে হবে। সুতরাং বর্ণ পরিচয় জানলে তবেই আপনি বই পড়তে পারবেন। বাস্তিক পবিস্থিতি এক নজরে জানতে হবে প্রাথমিকভাবে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে মানুষেব সম্পর্ক কোন একটা কাবণে হয় না। অনেকগুলো কারণে সম্পর্ক তৈবী হয। সমাজকর্মী হতে হলে আপনাকে মানুষের জন্য সময় দিতে হবে এবং অনেক ধৈর্যশীল হতে হবে। সমাজ সেবার কাজকে সময়ের সঙ্গে বেঁধে রাখলে চলবে না। সমাজকর্মীদের কাজ বলতে ১০ ৫টা ডিউটি নয়। সমাজকর্মী হতে হলে কাজের প্রতি দরদ, ভালবাসা, প্রেম প্রীতি ও নিষ্ঠা থাকা দরকার। আপনাকে অনেক বেশী সচেতন হতে হবে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন এবং কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। আপনি সামাজিক কাজ করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানে ঢুকেছেন সে কাজটার প্রতি দরদ থাকা দরকার। আপনার নৈতিক দায়িত্ব বা কর্তব্য হল আপনি যে কাজ করছেন সে কাজ সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা কবা। কৃষি বিষয়ে যদি দায়িত্ব নেন তাহলে আপনার চিন্তা করতে হবে কি ভাবে উন্নত পদ্ধতিতে উৎপাদন করা যায়, কোন জিনিস উৎপাদন করলে লাভ বেশী হবে ইত্যাদি। সুতরাং আপনাকেই নির্ণয় করতে হবে বা চিহ্নিত করতে হবে বা ঠিক করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে আপনার কাজটা যেন খাপ ছাড়া না হয়। দড়ি ছাড়া গরু যেন না হয়। একটা বিশেষ নিয়মের মধ্যে কাজ করতে হবে। বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে কিন্তু চেক পোস্ট নেই সমাজকর্মীদের ক্ষেত্রে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মৌলিক সমস্যা :

গ্রাম-গঞ্জে-শহরেব ঘনবসতি অঞ্চলে বহু ছোট ছোট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সমস্যাব উপর ভিত্তি করে এই সকল সংগঠনগুলি নানান ধরণের সেবা ও উন্নয়মূলক কাজ চালাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির সঠিক দিশা, পদ্ধতি বা পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভব হয়ে ওঠে না নানান কারণে, যেমন :-

১) প্রয়োজনীয় অর্থ বা উন্নয়নের জন্য উপাদানের অভাব,

২) উন্নয়ন এর জন্য সঠিক ধারণা বা পদ্ধতির অভাব,

৩) উন্নয়ন কর্মসুচ গুলো রূপায়ণ করার জন্য যথোপযুক্ত কর্মী বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রশিক্ষণের অভাব,

৪) উন্নয়ন কর্মসূচীগুলির গতিশীল বাখাব জন্য সঠিক পরিকল্পনা না থাকা ইত্যাদ।

সমাজ কল্যাণ বা সেবা কার্যাদির জন্য এই সকল ছোট সংগঠনগুলির মধ্যে যথেষ্ট নিষ্ঠা, সততা ও বিপ্লবী মনোভাব লক্ষ্য করা গেলেও এই সকল সংগঠনের সবচাইতে বড় দুর্বলতা হল উপরিউল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি।

সমাজ উন্নয়নের জন্য বর্তমান যুগে কেবলমাত্র মানবকল্যাণ বা সেবার উপর ভিত্ত করে কর্মসূচী গ্রহণই যথেষ্ট নয়। আধুনিক সমাজের অনুন্নতির কারণগুলি অনুসন্ধানের ও গোটা সমাজ ব্যবস্থার গতির উপর দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন আছে এবং সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠমো বিশ্লেষণেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, নচেৎ সঠিক সমাজ উন্নযন সম্ভব নয়। ঠিক তেমনই সমাজ উন্নয়ন করার জন্য সমগ্র দৃষ্টিভংগীর মধ্যেই শৃংখলা ও সংগঠন আনতে হবে। কারণ মানব সমাজের উন্নয়ন আধুনিক সমাজে অন্যান্য সকল কর্মসূচীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। আজ আর সমাজ উন্নয়ন ব্যক্তির ইচ্ছা, ভালো মানুষী দয়া-দাক্ষিণ্যেব বা বদান্যতার উপর নির্ভরশীল নয়। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যও নয় কিংবা যা ঘটতো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি নির্ভর কল্যাণ কর্মসূচী, তাও নয়।

আধুনিক সমাজে 'সমাজ কল্যাণ কর্মসূচী' একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে এবং কিছু ব্যক্তির কাছে তা বৃত্তিতেও পরিণত হয়েছে। বর্তমান সমাজে সমাজ উন্নয়ন করার জন্য সংগঠনের জোয়ার দেখা দিয়েছে গ্রামে-গঞ্জে, শহরের বস্তিতে বস্তিতে, সেটাই হ'ল সংগঠিত হবার প্রবণতা বা সংগঠিতভাবে সমাজ উন্নয়ন করার ইচ্ছা। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘ কয়েক দশক পার হয়ে যাওয়ার পরও আমাদের সমাজ উন্নয়নের প্রচেষ্টা সংগঠিত রূপ ধারণ করতে পারেনি। তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে···

১। সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনভাবে সঠিক ধারণা না গড়ে তোলা।

২। সংগঠনগুলির মধ্যে সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর বিস্তার ঘটেনি।

৩। সমাজ উন্নয়নে গোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে গুরুত্ব না দেওয়া বা ব্যক্তি মোহ কাটিয়ে তুলতে না পারা।

৪। সমাজ উন্নানে যুক্ত সংগঠনগুলির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি।

বস্তুতঃ সমাজ উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মানবিক ও বস্তুগত উপাদান আমাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নের কাজকে আমরা ত্বরান্বিত করতে পারিনি সঠিক ধারণা ও প্রশিক্ষণের অভাবে। অবশ্যই এই কাজ রাষ্ট্রীয় স্তরে সরকারী বা আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

একদিকে যেমন এই সকল সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমন ছোট ও বড় সংগঠনের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ব্যক্তিদ্বন্দ্ব ইত্যাদিরও প্রভাব বেড়েছে···মতাদর্শ অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ছোটবড় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সৃষ্টি হয়েছিল তা ঐ সকল গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে। দলগুলি ভেঙে ভেঙে উপদলের শিকার হয়েছে। সমাজ উন্নয়নের মতাদর্শ যা ছিল তার বিকৃত রূপ দেওয়া হচ্ছে। মূলতঃ যে সকল মানুষদের নিয়ে বা যাদের জন্য সমাজ উন্নয়ন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হচ্ছে এই সকল সংগঠনগুলিকে।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সমাজ উন্নয়নমূলক সংগঠনগুলির মধ্যে হতাশা বিচ্ছিন্নতা এবং উপাদানের সঠিক ব্যবহার না করার দৃষ্টান্ত দেখা দিচ্ছে। অথচ সমাজ উন্নয়নের জন্য লক্ষ লক্ষ সমাজকর্মী তৈরী হয়েছে সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে, সর্বোপরি এবং 'সমাজ উন্নয়ন' একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে

যদিও এই সকল সংকটগুলির মূল কারণরূপে সংগঠনের মধ্যেকার মতাদর্শের কথাই বলা যায়। তবুও সংগঠনের মধ্যে—১) নেতা বা কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক (ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক), ২) সংগঠন ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক (যাদের জন্য উন্নয়ন) ব্যক্তিগত ও প্রশাসনের মধ্যে সমস্যার তীব্রতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সমাজ উন্নয়নের জন্য ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু শুধু অংশগ্রহণ নয় সঠিকভাবে তার নিয়ন্ত্রণের উপরও জোর দেওয়া প্রয়োজন। যা সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিরা সচেতন ভাবে পালন করেন না বা এ বিষয়ে আদৌ সচেতন নন। যদিও এ বিষয়ে নতুনভাবে বহু সংগঠন ভাবনা শুরু করেছেন।

আধুনিক সমাজে উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য যে হাজার হাজার সংগঠনগুলির অগ্রণী ভূমিকা দেখা যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই এখনও নিজেদের তৈরী করতে পারেনি। সমাজ কল্যাণমূলক কাজ একদিকে যেমন সংগঠিত রূপ নিচ্ছে, অন্যদিকে এই কাজটা এখন পেশায় পরিণত হয়েছে কিন্তু তা সত্বেও সংগঠনগুলি বহু বিষয়ে এখনও অজ্ঞ বা অচেতন। বিশেষতঃ পরিকল্পনা ও কাজের পদ্ধতি নির্ধারণ করা বিষয়ে।

বড় বড় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া 'সমাজকর্ম' শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। আর যেগুলি আছে সেগুলি কোন নীচের তলার সমাজকর্মীদের জন্য নয়। সরকারীভাবেও এই ধরণের সমাজকর্মী তৈরী করার কোন উদ্যোগ নেই। যদিও গ্রাম উন্নয়ন পর্যায়ে সরকার বহু সমাজকর্মী নিয়োগ করেন। ইদানীং সর্বভারতীয় পর্যায়ে বেসরকারী উন্নয়নমূলক সংস্থাদের উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ চালু করার একটা বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এখনও সেই সকল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি এবং তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্পমাত্র।

পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা :

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে : দেশ এমন নীতি নির্ধারণ করবে এবং মেনে চলবে যাতে ক) দেশের প্রত্যেক নাগরিক, পুরুষ এবং স্ত্রীলোক নির্বিশেষে সকলেরই খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মত অধিকার এবং সঙ্গতি থাকবে ; খ) দেশের সম্পদ এমনভাবে কাজে লাগানো হবে যাতে দৈনন্দিন জীবনের ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজনীয়তা মেটে এবং তা দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে বণ্টন করা হয়। গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য না থাকে এবং দেশের সম্পদ যাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভোগ না করে" ইত্যাদি কিন্তু দুঃখের বিষয় সংবিধানের প্রত্যেকটি বিধানই বর্তমানকালে পরিহাসে পরিণত হয়েছে। আজ পর্যন্ত আটটি পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা গঠিত হয়েছে তদুপরি উন্নয়নের ধাপে পৌছাতে আমাদের বেশ কষ্টই হচ্ছে। তাহলে নিশ্চই কোথাও কোন প্রতিবন্ধকতা আছে। সেটাই আলোচনার জন্য আমরা কর্মসূচীর নীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫১-১৯৫৫-৫৬) বলা হয়েছে, যে প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন বেকারত্ব মোচন এবং অর্থনৈতিক সমতা রক্ষা করা ও সামাজিক ন্যায় বজায় রাখাই হল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। প্রথম পরিকল্পনার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখ্য ছিল : ১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশ বিভাগের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যেভাবে ভেঙে পড়েছিল সেই কাঠামোকে পুনর্গঠিত করা . ২) খাদ্য সমস্যার সমাধান করা ; ৩) পাট এবং সুতা শিল্পে কাঁচামাল সহজে সরবরাহ করা ; ৪) আনুষঙ্গিক উন্নয়ন অর্থাৎ সেচ, রেলওয়ে, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ; ৫) উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সুষ্ঠু প্রকল্প নির্মাণ এবং কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দান এবং পরিচালন ব্যবস্থাকে সুগঠিত করা ইত্যাদি। এছাড়াও কৃষি উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত হলে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা উৎপাদন হয়েছিল অনেক বেশী। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনও এই সময়ে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ে

সেচের ব্যবস্থা, সমবায় আন্দোলন ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আইনের পুনর্বিন্যাস ঘটে। শিল্পেও প্রচুর পরিমাণ টাকা ব্যয় ও নতুন শিল্প গড়ে তুলবার জন্য ঢালাও ভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়। এই সময়ে প্রতি বছরে শিল্প উৎপাদন হত ৭ শতাংশ হারে। সিন্ধ্রি সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, ভারতীয় দূরভাষ শিল্প তার শিল্পের কারখানা, পেনিসিলিন প্রস্তুতকারী কারখানা প্রভৃতি এই সময় স্থাপিত হয়। নতুন শিল্প গড়ে তুলবার জন্য ৩৪০ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ শিল্প বিকাশের জন্য ৪৩ কোটি টাকা খরচ করা সত্ত্বেও এই কর্মসূচী তেমনভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। জাতীয় আয় এই সময় প্রায় ১৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং মাথাপিছু আয় প্রায় ১১ শতাংশ মত বাড়ে। তথাপি অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে এই সময়ে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫৬-১৯৬০-৬১) সময় ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তুলনায় অনেক স্থির। এই সময়ে কৃষি-ব্যবস্থার চেয়ে যন্ত্রশিল্পের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণা ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন কারণ সেই সময়েই ভারতে প্রথম "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে উন্নয়নকে" স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এবং এই নীতি ভারতে কতখানি রূপায়িত হয়েছিল বাস্তবে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ ছিল :

ক) জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়নো এবং শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, খ) প্রধান এবং ভারী শিল্পের প্রসার, অর্ধ-বেকারত্ব মোচন : গ) ক্ষুদ্রশিল্প এবং কুটির শিল্পের বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং ঘ) আয় এবং সম্পত্তির বৈষম্য মোচন।

প্রথম পরিকল্পনার চেয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে উচ্চাকাঙ্খী বলা হয় কারণ প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় আয়তন যথেষ্ট বড় ছিল। ফলে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে প্রভূত ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে

আর সেই জন্য মুদ্রা স্ফীতি অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন না হওয়ায় কৃষি উৎপাদন হ্রাস, মূল্যস্তর বৃদ্ধি, ব্যাপক বেকারত্ব এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংকট দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬) কৃষি উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এর সাথে সাথে দেশের মূল শিল্প যথা লৌহ, জ্বালানী, তাপশক্তি, রসায়ন শিল্প এবং যন্ত্রপাতি নির্মান প্রভৃতি উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ ছিলঃ ক) অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা এবং স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা ; খ) জাতীয় আয় অন্ততঃ বছরে পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি করা ; গ) খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জন করা ; ঘ) যন্ত্রশিল্পের প্রসারের জন্য যথেষ্ট পরিমানে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ; ঙ) বেকারত্ব মোচন করে দেশের শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে নিয়োজিত করা এবং ; চ) অর্থনৈতিক বৈষম্য মোচন করা। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় লেখা হয়ঃ "আমাদের প্রথম দায়িত্ব হল জনগণের মূল চাহিদা অর্থাৎ খাদ্য, চাকুরী, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থানের চাহিদা এবং সর্বোপরি এমন এক আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাতে জনগণ মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে"।

আগের মতনই অর্থনৈতিক মন্দা, খাদ্যসংকট, মুদ্রামান হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ইত্যাদি ঘটনা তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। খাদ্যসংকট, বেকারত্ব মেটানো তো দূরের কথা আরও তীব্র হয়ে ওঠে

তিনটি পরিকল্পনা অতিক্রম করার পর চতুর্থ পরিকল্পনার (১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭৩-৭৪) সময়কাল॥ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিলঃ ক) অর্থনীতির বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্ব এবং খ) আর্থিক স্বয়ংভরতার পরিপূর্ণতা। মোটামুটিভাবে যে ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া লেখা হয়েছিল তা হল ; ক) জাতীয় আয় অন্তত: ৫½ শতাংশ বৃদ্ধি করা ; খ) সামাজিক ন্যায় বিচারকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং সর্বস্তরে ক্ষমতা বজায়

রাখা; গ) ভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির সঙ্গে সমঝোতা বজায় রাখা; ঘ) চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং দেশের অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা: ঙ) ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত আইনের পুর্ণবিন্যাস ও নবীকরণ এবং চ) ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ।

কিন্তু অন্যান্য পরিকল্পনার মতন এই পরিকল্পনাও সন্তোষজনক হয়নি। তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, বিদ্যুৎসংকট, তৈলসংকট, বিদেশী মুদ্রাসংকট, ব্যাপক বেকারত্ব, শিল্পোৎপাদন হ্রাস পরিকল্পনা রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করে।

পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯২৮-৭৫ থেকে ১৯৭৮-৭৯) দারিদ্র মোচনের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। খসড়ায় বলা হয়: 'দারিদ্র মোচন এবং অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জন করাই হল দেশের প্রধান কর্তব্য। এছাড়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ ধরে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোট দূর করতে হবে আয় এবং সম্পদের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে—আঞ্চলিক উন্নয়নই হবে আমাদের লক্ষ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অগ্রসর হতে হবে এক ন্যায়নিষ্ঠ এবং মুক্ত সমাজের দিকে"। একই সাথে যে সকল উদ্দেশ্য নিয়ে পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া লেখা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল; ক) ৫.৫ শতাংশ হারে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি: খ) কর্মসংস্থানের প্রতি নজর দেওয়া; গ) নিম্নতম তাগিদ মেটাবার চেষ্টা। এই নিম্নতম তাগিদের অন্তর্ভুক্ত হল; নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গ্রামে চিকিৎসার সুব্যবস্থা, পুষ্টি, ভূমিহীন মজুরকে বাসস্থানের জন্য জমি দান, গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ বস্তি উন্নয়ন এবং বস্তি অপসারণ ইত্যাদি: ঘ) সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচীর প্রসার; ঙ) কৃষি এবং যন্ত্রশিল্পের বিকাশ, চ) দরিদ্র জনগণকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সুলভে যোগান দেওয়া; ছ বাজার দরের সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং; জ) সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাদেশিক বৈষম্য মোচন করা। প্রকারান্তে যত পরিকল্পনা এগোচ্ছে ততই ভাল ভাল কথা শোনান হয়েছে কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে দারিদ্র মোচনের কথা ফলাও করে বলা হয়েছে, সেই দারিদ্র মোচন